প্রকৃতি

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কলিকাতা

৪নং কলেজ স্কোয়ার "বঙ্কিমচন্দ্র" যন্ত্রে

শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ

পিতঃ উপেন্দ্রসুন্দর দেব,

জ্ঞানের প্রবাহ সংসার প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই দুর্ব্বল দেহে সেই প্রবাহে ভাসিয়া চলিবারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু উষর সংসারমরুতে জ্ঞানের অপেক্ষা প্রেমের প্রবাহের প্রয়োজন অধিক; আতপদগ্ধ নরনারী স্নেহবারির জন্য লালায়িত। হতভাগ্য বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র পল্লীর নিভৃতদেশে যে স্নেহের উৎস ও করুণার প্রস্রবণ পরিজনবর্গের ও প্রতিবেশিবর্গের শুষ্ককণ্ঠে অনাতধারা ঢালিয়া দিত, তাহা অকালে রুদ্ধ হইয়াছে। কেন আসে কেন যায়, দিয়া কেন হরিয়া লয়;—প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর লীলাখেলার উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য দেশবিদেশের জ্ঞানিজনের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছি। জ্ঞানের নিকট সান্ত্বনা মিলে নাই; স্নেহের পিপাসা জ্ঞানে মিটায় নাই। ভ্রাতৃবৎসল, তুমি ভ্রাতার নিকট গিয়াছ; তোমার বঞ্চিত পরিজনবর্গ ও বন্ধুবর্গ অশ্রুজলে তোমার তর্পণ করিতেছে। এই অশ্রুধারা মন্দাকিনীর বারিধারা; আমার এই শুষ্ক কুসুমগুলি সেই বারিধারায় অভিষিক্ত; ইহাতেই তোমার তৃপ্তি হউক।

ভাগ্যহীন পুত্র

গ্রন্থকার

বিজ্ঞাপন

গত কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞানপ্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করিনা।

প্রবন্ধগুলি নবজীবন, সাধনা, সাহিত্য, দাসী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই কয়খানি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তিনটি প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। প্রথম প্রস্তাবটি ব্যতীত অন্যত্র অধিক সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় নাই। ঐ প্রথম প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্বে নবজীবনে সৃষ্টিতত্ত্ব নামে বাহির হইয়াছিল। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ফল প্রাকৃত সৃষ্টি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আয়াসলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি; আমাদের ঋণগ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ঋণগ্রহণে কুণ্ঠিত হইবারও প্রয়োজন দেখিনা।

জেমোকান্দি
আশ্বিন, ১৩০৩

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সূচী

প্রকৃতি।

সৌরজগতের উৎপত্তি।

রাত্রিকালে আমরা যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহার এক একটি তারকা এক একটি সূর্য্য। আমাদের সূর্য্যও একটি ক্ষুদ্র তারকামাত্র; অনেক তারকা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। সহজ দৃষ্টিতে আমরা ছয়হাজারের অধিক তারা দেখিতে পাই না; কিন্তু দূরবীক্ষণ-গোচর তারার সংখ্যা প্রায় দুইকোটি। দূরবীক্ষণেরও অগোচর কত নক্ষত্র জগতে রহিয়াছে, কে বলিতে পারে?

এই জগৎ অতি বিশাল। আমাদের ক্ষুদ্র সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর বারলক্ষগুণ। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয়কোটি বিশলক্ষ মাইল। যে কয়টি নক্ষত্রের দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র হইতে আলোক আসিতে সওয়া চারি বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশিহাজার মাইল। পরস্পর এইরূপ কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যবধানে রহিয়া দুইকোটি তারকা বিচরণ করিতেছে, মনে কর জগৎ কত বড়! দূরবীক্ষণগোচর সুদূরপ্রদেশস্থ তারকা হইতে আলোক আসিতে অনুমান তিন চারি হাজার কি ততোধিক বৎসর অতিক্রম হয়।

এই সংখ্যাতীত তারকাপুঞ্জের মধ্যে আমাদের তারকা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস, নেপচুন

এই আটটি বড় বড় গ্রহ,এবং সার্দ্ধশতাধিক* ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্ট বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার বৃহত্তর গ্রহকতিপয়ের পার্শ্বে কতকগুলি উপগ্রহ নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ধূমকেতু, উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমমাণ। এই গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জবেষ্টিত সূর্য্যকে লইয়া জগতের যে অংশ, তাহারই নাম সৌরজগৎ। সূর্য্য ইহার কেন্দ্রীভূত। বৃহস্পতি সকল গ্রহের বড়; নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম; সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান পৃথিবীর ব্যবধানের ত্রিশ গুণ।

নিউটন দেখাইয়াছেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সমুদয়ই নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাদের গতির সম্বন্ধে সকল বৈচিত্র্যই এই নিয়মের অনুযায়ী। কিন্তু সৌরজগতের গঠনে কয়েকটি বৈচিত্র্য আছে, নিউটনের নিয়ম তাহা বুঝাইতে পারে না।

(১) গ্রহগুলি আকাশমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে; উহাদের সকলেরই পথ প্রায় এক সমতলোপরি অবস্থিত; এবং সেই সমতল প্রায় সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্তের সহিত একতলে রহিয়াছে। (কেবল ছোট গ্রহগুলির, বিশেষতঃ ধূমকেতুগণের পথ সেই সমতল হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন।)

(২) সূর্য্য নিজের অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করে; আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল গ্রহই ঠিক্ সেই মুখেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। (কেবল কতকগুলি ধূমকেতুমাত্র পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে ভ্রমণ করে।)

(৩) আবার গ্রহদিগের অক্ষোপরি আবর্ত্তনেরও দিক্ ঠিক্ তাহাই, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। (কেবল উরেনস ও নেপচুন এই নিয়মের বহির্ভূত।)

* আধুনিক হিসাবে প্রায় চারিশত।

(৪) গ্রহের ন্যায় উপগ্রহগুলিও ঠিক্ সেই সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত ; তাহাদেরও গতির মুখ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। (উরেনসের উপগ্রহগণ ভিন্ন তলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে ভ্রমণ করে।)

(৫) সূর্য্য হইতে গ্রহগুলির ব্যবধান একটি সুন্দর নিয়মের অনু-যায়ী, তাহার নাম বোড সাহেবের নিয়ম।

০ ৩ ৬ ১২ ২৪ ৪৮ ৯৬ ১৯২

প্রত্যেকে ৪ যোগ কর ;

৪ ৭ ১০ ১৬ ২৮ ৫২ ১০০ ১৯৬

বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল — বৃহস্পতি শনি উরেনস।

বুধের দূরত্ব যদি ৪ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে পর পর লিখিত সংখ্যা পর পর লিখিত গ্রহের দূরত্ব-পরিমাপক হইবে। ২৮ সংখ্যার নীচে কোন গ্রহের নাম নাই ; বহুপূর্ব্বে কেপলার অনুমান করিয়াছিলেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহ থাকিবে। গত শতাব্দীতে যখন উরেনস আবিষ্কৃত হইল এবং তাহার দূরত্বও উক্ত নিয়মানুযায়ী ১৯৬ পরিমিত দেখা গেল, পণ্ডিতেরা কেপলারের অনুমিত গ্রহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ ২৮ পরিমিত প্রদেশে এক বৃহৎ গ্রহের পরিবর্ত্তে এ পর্য্যন্ত ১৬০টি * অতি ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সহজেই অনেকে মনে করিয়াছিলেন, বড় গ্রহটি কোনরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়া এই খণ্ডগ্রহগুলিতে পরিণত হইয়াছে। †

* প্রায় চারি শত।

† সম্প্রতি জ্যোতিষীরা ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। এই ব্যাখ্যা নীহারিকা-বাদের অনুযায়ী। নেপচুনের দূরত্ব বোডের নিয়মের অনুযায়ী না হওয়ায় পণ্ডিতেরা উহাতে আর বড় শ্রদ্ধা দেখান না।

উল্লিখিত বৈচিত্র্যগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে পরস্পর কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে। এই সম্বন্ধ তাহাদের সৃষ্টি বা জন্মকাল হইতেই রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধ কি? এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? গ্রহ উপগ্রহাদি যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, যদৃচ্ছমুখে না চলিয়া, এরূপ সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত কেন?

সৌরপরিবারের জ্যোতিষ্কদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এবং পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি তত্ত্বের সাহায্যে দেখিতে গেলে এই প্রশ্নের একটি উত্তর সহজেই মনে উদিত হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় গরম। ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যতই নীচে যাওয়া যায়, ততই তাপাধিক্য অনুভূত হয়। তপ্তস্রোত, ভূকম্প, অগ্নিগিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ, পর্ব্বতাদির উন্নয়ন, ভূখণ্ডবিশেষের ক্রমিক উত্থান ইত্যাদির একমাত্র সম্ভবপর কারণ,—ভূগর্ভস্থ তাপ। উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই তাপ বিকিরণ করে ও কালক্রমে শীতল হয়; শীতল হইলে তাহার আয়তনও কমিয়া যায়। সুতরাং বহুপূর্ব্বে ভূমণ্ডল আরও উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় ছিল; তাহারও পূর্ব্বে যখন উত্তাপ আরও অধিক ছিল, তখন পৃথিবী বাষ্পময়ী ছিল, সন্দেহ নাই। তখন ইহার আয়তন যে অনেক বেশী ছিল, সহজেই বুঝা যায়। পৃথিবীর বর্ত্তমান কঠিনাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিতে কল্পনাতীত কাল গত হইয়াছে। সর উইলিয়ম টমসন * বিজ্ঞানোদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবী কত বর্ষ পূর্ব্বে তরল ছিল, গণনা করিয়াছেন।

সূর্য্যও অবিরত তাপ বিকিরণ করিতেছে। একটি কয়লার পৃথিবী

---

* সম্প্রতি লর্ড কেলবিন।

গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে, যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিকীর্ণ তাপের ২২৭,০০,০০,০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে পতিত হয়; তাহাতেই পৃথিবীতে এত কার্য্য চলিতেছে। মনে কর, সমস্ত তাপের পরিমাণ কত!

সূর্য্যের এই তাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? কেহ বলিবেন সূর্য্যোপরি দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে; কেহ বলেন, অজস্রধারায় উল্কাপিণ্ড সূর্য্যোপরি বৃষ্ট হইতেছে, তজ্জন্যই এত তাপ। হেলমহোলৎজ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কি রাসায়নিক ক্রিয়া, কি উল্কাপতন, কিছুতেই এত তাপ জন্মাইতে পারে না। কেবল একমাত্র উপায় আছে। সূর্য্যের অবয়বের সঙ্কোচে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। সূর্য্যের অবয়ব যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহার পরমাণুরাশি যতই পরস্পর সান্নিধ্যে আসিতেছে, ততই তাপোদ্গম হইতেছে। হেলমহোলৎজ্ গণিয়া বলেন, সূর্য্যের ব্যাস ৮৫ মাইল মাত্র কমিতে হইলে যে তাপ জন্মে, তাহাতে ২২৯০ বৎসর তাপ বিকিরণ চলিবে।* উক্ত পণ্ডিত দেখাইয়াছেন সূর্য্য আদিকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া ছিল, তাহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই সঙ্কোচনেই তাহার তেজ এতকাল উৎপন্ন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এই প্রচণ্ড তেজোরাশির উৎপত্তির আর কোন সম্ভবপর কারণ থাকিতে পারে না।

এই সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত মূল করিয়া সৌরজগতের উৎপত্তি-প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে।

* এই হিসাব অনেকটা স্থূল।

বিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট এই অনুমানের উদ্ভাবয়িতা; অদ্বিতীয় গণিতবিৎ লাপ্লাস্ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। দেখা যাউক সে প্রণালী কি।

আদিতে সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই বিভিন্নমুখ গতি একীভূত হওয়াতে সেই বাষ্পরাশির ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে এক মহতী আবর্ত্তগতি উৎপন্ন হইল। তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে আণবিক আকর্ষণবলে সেই বিশাল পিণ্ড সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। পিণ্ডের আয়তনহ্রাসের সহিত তাহার আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেগবৃদ্ধির সহিত কেন্দ্রাপসারণ বলের বৃদ্ধি হওয়ায় সেই দ্রব জড়পিণ্ডের নিরক্ষদেশ স্ফীত হইল ও মেরুপ্রদেশ চাপিয়া গেল। ক্রমিক সঙ্কোচনে কেন্দ্রাপসারণ বল আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ফীত নিরক্ষদেশ তরলপিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি অঙ্গুরীর আকার ধারণ করিল। এখন দেখিতে পাই, যে অভ্যন্তরে একটি পিণ্ড নিজ অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করিতেছে এবং ক্রমেই ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতেছে; এবং একটি বিশাল চক্রাকার অঙ্গুরীয়ক তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইতে না পারিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া সেই মুখেই ঘুরিতেছে। কালক্রমে পিণ্ডটি আরও সঙ্কুচিত হইল, আরও প্রবৃদ্ধবেগ হইল এবং আর একটি ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীয় সৃষ্টি করিল। এইরূপে নয়টি অঙ্গুরীয়ক আজি পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যস্থ তরলপিণ্ড ঘনীভূত ও শীর্ণকায় হইয়া আজিও মহাবেগে নিজ অক্ষোপরি আবর্ত্তন করিতেছে এবং আজিও শরীর সঙ্কোচন দ্বারা তাপ জন্মাইয়া দিগন্তে বিকিরণ করিতেছে।

এই এক একটি অঙ্গুরীই এক এক গ্রহসৃষ্টির নিদান। সেই অঙ্গুরী কখনই চিরকাল সমভাবে থাকিবে না; কিছু দিনেই বিভিন্নাংশে বিভিন্নপরিমাণ সান্দ্রতাবশতঃ ও বিভিন্নবলযুক্ত হওয়াতে ছোট বড় সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং খণ্ডগুলি বিভিন্নবেগে একই পথে চলিতে থাকিবে। পরে কালক্রমে এই খণ্ডসহস্র পরস্পর আকর্ষণে একত্র সম্মিলিত হইয়া, একটি পিণ্ডের আকার ধারণ করিবে। পূর্ব্বে যাহা অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহাই আবার বর্ত্তুলাকার হইয়া সেই বিশাল আদিম পিণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। এই ক্ষুদ্র বর্ত্তুলটিই একটি গ্রহ।

আবার সেই বড় পিণ্ড যে কারণে ঘনীভূত হইয়া নিজ শরীর হইতে গ্রহের সৃষ্টি করিল, ক্ষুদ্র পিণ্ড গ্রহও সেই কারণেই ক্রমে শীতল ও ঘনীভূত হইয়া নিজ অবয়ব হইতে ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীয়ক সৃষ্টি করিবে, এবং সেই অঙ্গুরী আবার পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রতর উপগ্রহকে জন্ম প্রদান করিবে। এইরূপে পৃথিবীর এক, বৃহস্পতির চারি, * শনির আট এবং উরেনসের চারি চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী তারল্য ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠভাগে কঠিন হইয়াছে; সুতরাং ইহার আর অঙ্গুরীজননের সম্ভাবনা নাই; তথাপি আবর্ত্তনজনিত কেন্দ্রাপসারী বলপ্রভাবে ভূমণ্ডলের নিরক্ষদেশ আজিও স্ফীত এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ "কিঞ্চিৎ চাপা"। শনৈশ্চরের অঙ্গুরীয়ক আজিও বর্ত্তমান এবং তাহাতে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নিয়তই লক্ষিত হইতেছে।

কেবলমাত্র যুক্তির উপর বৈজ্ঞানিক নির্ভর করেন না; গণিতের সিদ্ধান্তগুলিও পরীক্ষাদ্বারা চোখের উপর দেখিতে চাহেন।

* এখনকার হিসাবে পাঁচ।

ফরাসীস পণ্ডিত প্লাতো তৈলের তরল পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কৌশলক্রমে ঘুরাইয়া তাহা হইতে তৈলের অঙ্গুরীয়ক ও তৈলের গ্রহ উপগ্রহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই বিশাল সৌরজগতের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র জগৎ তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল।

কতিপয় ঘটনা এই তত্ত্বের বিরোধী; অনেকে সে সকলেরও মীমাংসার প্রয়াস পাইয়াছেন; তবে সঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই।

সকল গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে চলে। আবার অক্ষের উপর আবর্ত্তনও প্রায় সকলেরই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। প্রায় বলা গেল, কেন না উরেনস ও নেপচুনের পক্ষে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ ইহাদের আবর্ত্তনব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ সহজ নহে। আবার গ্রহগণের নিরক্ষবৃত্ত উহাদের স্ব স্ব পথ হইতে অধিক হেলিয়া নাই। পথ ও নিরক্ষবৃত্তের অন্তর্গত কোণ পৃথিবীর পক্ষে ২৩৷৷০ অংশমাত্র, মঙ্গলের ২৫ অংশ, শনির প্রায় ২৭ অংশ, বৃহস্পতির ৩ অংশমাত্র, কিন্তু উরেনসের পক্ষে প্রায় ৬০ অংশ। গ্রহের পার্শ্বে যে সকল উপগ্রহ আছে, তাহারাও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করে। উরেনসের উপগ্রহেরা বিপরীত মুখে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, উরেনসের এবং সম্ভবতঃ নেপচুনের উৎপত্তিকালে এমন কোন কারণ বর্ত্তমান ছিল, যাহা পরবর্ত্তী গ্রহগণের সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয় নাই।

সূর্য্য হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়, স্থূলতঃ গ্রহগণ ততই বড় হয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল অপেক্ষা বৃহস্পতি, শনি, উরেনস ও নেপচুন অনেক বড়। ইহাই সম্ভব। কেননা বুধাদি গ্রহ ছোট ছোট অঙ্গুরী ও বৃহস্পতি বড় বড় অঙ্গুরী হইতে

উৎপন্ন। কিন্তু এই নিয়মটা কেবল স্থূল হিসাবেই খাটে। সূক্ষ্ম হইলে বৃহস্পতির অপেক্ষা শনি, উরেনস ও নেপচুন ছোট হইত না।

বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মধ্যে একটি বড় গ্রহের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেন অঙ্গুরীটা শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে; যেন কোন কারণে এই খণ্ডগুলি জমাট বাঁধিতে পায় নাই। মহাকায় বৃহস্পতির সান্নিধ্য ইঁহার কারণ কি না বলা যায় না। বৃহস্পতি ওজনে তিনশত পৃথিবীর সমান। আর এই সকল গ্রহের মধ্যে বৃহত্তমের ব্যাস প্রায় তিনশত মাইলমাত্র; অনেকের ব্যাস কুড়ি মাইলেরও কম।

বড় গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা অবশ্য ছোট গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। বাস্তবিকই মঙ্গলের দুইটিমাত্র উপগ্রহ এবং বুধ ও শুক্র উপগ্রহহীন; পৃথিবীর একটিমাত্র উপ-গ্রহ আছে; বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাকায় গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা অনেক বেশী।

একমাত্র আয়তন উপগ্রহসংখ্যার নিয়ামক নহে। কেন্দ্রাপসারণ বলই অঙ্গুরীসৃষ্টির মুখ্য কারণ। যাহার সেই বল যত বেশী, উপগ্রহসংখ্যা তাহার সেই পরিমাণেই বেশী হওয়া সম্ভব। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক ঘুরে; শনি তাহার বিশাল দেহ দশ ঘণ্টা মাত্রেই একবার আবর্ত্তন করে। কাজেই ইহার কেন্দ্রাপসারণ বল অনেক বেশী। উপগ্রহ সংখ্যাও আট। ইহার অঙ্গুরীয়ক আজিও বিদ্যমান।

অধুনাতন পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে চারিদিক হইতে নূতন নূতন প্রমাণ আসিয়া এই সৃষ্টিপ্রণালীর সমর্থন করিতেছে।

আদিতে পৃথিবী ও সূর্য্য এক ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে

পৃথিবী ও সূর্য্য একই পদার্থে নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। এতদিন এই প্রশ্নের উত্তর অসম্ভাবিত ও কল্পনারও অগোচর ছিল; অধুনা নবাবিষ্কৃত আলোকবিশ্লেষণযন্ত্রের সাহায্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্যেও লৌহ, তাম্র, দস্তা, সোডিয়ম, উদজান প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান।

ছোট গ্রহ সর্ব্বাগ্রেই শীতল ও কঠিন হইবে; বড় গ্রহের তদবস্থা পাইতে অবশ্যই বিলম্ব হওয়া উচিত। গ্রহদের প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; ইহা একবারে কঠিন হইয়াছে; তরল জল ও বায়ুর লেশমাত্র ইহাতে নাই; ইহার প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরিসমূহ বহুদিন অগ্ন্যুদ্গম ত্যাগ করিয়া নির্জীব হইয়াছে, সুতরাং ইহার অভ্যন্তরও শীতল। আবার পৃথিবী চন্দ্রের পঞ্চাশগুণ বড়। ইহার অভ্যন্তর আজিও অগ্নিময়; পৃষ্ঠভাগ শীতল বটে, কিন্তু অদ্যাপি কিয়দংশ (বায়ুমণ্ডল) বাষ্পীয়, কিয়দংশ (মহাসাগর) তরল আকারে বর্ত্তমান। পৃথিবীর জীবন শেষ হইতে এখনও অনেক দিন বাকী। শুক্র ও মঙ্গল বয়সে ও আয়তনে অনেকাংশে পৃথিবীর অনুরূপ; তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থাও অনেকাংশে পৃথিবীর সদৃশ। মঙ্গল বায়ুরাশিতে বেষ্টিত; ইহার পৃষ্ঠভাগ মহাদেশ ও মহাসাগরে বিভক্ত; ইহার মেরুপ্রদেশ তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন; গ্রীষ্মাগমে তুষাররাশি গলিতে থাকে, আবার শীত আসিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শনি ও বৃহস্পতি যেমন প্রকাণ্ডকায়, ইহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। অদ্যাপি তাহারা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে তারল্য ত্যাগ করে নাই। নিম্নের তালিকায় পৃথিবীর সহিত তাহাদের সান্দ্রতার তুলনা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

গ্রহ।		সান্দ্রতা।	
বুধ	(ক্ষুদ্র গ্রহ)	·৭২	(প্রায় সমান)
শুক্র		·৮৯	
পৃথিবী		১·০০	
মঙ্গল		·৭২	
বৃহস্পতি	(বড় গ্রহ)	·২৪	(অনেক কম)
শনি		·১৩	
উরেনস		·২৩	
নেপচুন		·২১	

বৃহস্পতি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়; তাহার অবস্থাও অনেকাংশে সূর্য্যের অনুরূপ। রাশি রাশি বাষ্পীয় পদার্থ মহামেঘের মত তাহার বিশাল শরীর আবৃত রাখিয়াছে, এবং মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। প্রবল বাত্যার ন্যায় প্রচণ্ডবেগশালী বাষ্পরাশি বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশ অনুক্ষণ আন্দোলিত করিতেছে। বৃহস্পতি সূর্য্যের উপযুক্ত সন্তান। শনিও অনেকাংশে বৃহস্পতির সদৃশ।

আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহা অপরাপর তারকা-জগৎ পক্ষেও খাটে। প্রত্যেক তারকাই বোধ হয় এক একটি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ; সেই প্রত্যেক জগৎই এই একই প্রণালীতে সমুদ্ভূত। তারাগুলি সর্ব্বাংশেই সূর্য্যের অনুরূপ; সৃষ্টিক্রিয়াও একই প্রণালীতে হইয়াছে। তবে কোনটি অত্যন্ত প্রাচীন, কোনটি বা আধুনিক, কোনটি বা শীতল ও নির্ব্বাণোন্মুখ, কোনটি আজিও নূতন নূতন অঙ্কুরী উৎপাদনে প্রবৃত্ত। আলোক বিশ্লেষ করিয়া দেখা গিয়াছে, সকল তারাই একরূপ পদার্থে নির্ম্মিত। পণ্ডিতেরা নক্ষত্রের বর্ণদৃষ্টে তাহাদের বয়স নিরূপণে

প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন নক্ষত্র যুগ ব্যাপিয়া আলোক দান করিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহের মত নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাপিত হইয়াছে। লুব্ধক ও প্রশ্বান নামক অত্যুজ্জ্বল তারকাদ্বয়ের পার্শ্বসহচর তারা দুইটি এইরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারা দূরবীক্ষণের দূর-দৃষ্টির অগোচর, গণিতশাস্ত্রের* অব্যাহত তীক্ষ্ণ দর্শনের বিষয়ীভূত মাত্র।

তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আকাশের মধ্যে এমন সূর্য্য দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা, যাহারা আজিও জীবনোন্মুখ, আজিও যাহারা আদিম বাষ্পময় নীহারিকা অবস্থায় আকাশক্ষেত্রে বিস্তৃত অংশ ব্যাপিয়া আছে, যাহাদের শরীর হইতে ভবিষ্যতে গ্রহ-উপগ্রহ-শোভিত বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হইবে।

গত শতাব্দীতেই এইরূপ পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ-সহকারে আকাশমধ্যে কুজ্ঝটিকার মত যে সকল নীহারিকা দেখা যাইত, হর্শেলের মতে সেই সকল সেই আদিম বাষ্পময় জগৎ। সর জন হর্শেল তদীয় দূরবীক্ষণ সহকারে দেখাইয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বাষ্পময় নহে; অতীব দূরবর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ-মাত্র। সেই অবধি কোন কোন জ্যোতিষী তাহাদের বাষ্পময়ত্ব অস্বীকার করিয়া লাপ্লাসের মত ভিত্তিরহিত হইল বোধ করিতেন। কিন্তু আজি কালি হগিন্স আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র হইলেও অনেকেই বস্তুতঃ বাষ্পময়; এতদ্বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। এই আবিষ্কার 'নীহারিক' হইতে জগতের উৎপত্তি সমর্থন করিতেছে।

* শুনা যায় লুব্ধকের পার্শ্বচর ভাল দূরবীক্ষণের গোচর হইয়াছে।

ধূমকেতু কি? ধূমকেতুও মাধ্যাকর্ষণবলে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে। ইহাদের আকার নানাবিধ। আয়তন অতিশয় বৃহৎ; ১৮৬১ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ দুইকোটি মাইল দীর্ঘ; ১৮৪৩ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে এগারকোটি মাইল। কিন্তু মস্তকসমেত ইহাদের ওজন নিরতিশয় অল্প; দুই দশ সের মাত্র; সামান্য কারণেই ইহারা কক্ষভ্রষ্ট হয়। আলোক বিশ্লেষণদ্বারা ইহাদের শরীরে বাষ্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। সহজেই অনুমান হয়, ইহারা সৌরজগতের উপাদানভূত বাষ্পরাশির অবশেষ মাত্র।* আদিম জগতের মেরুপ্রদেশসান্নিধ্যে গতির বেগ অল্প হওয়ায়, সেখানকার দুই এক টুকরা বাষ্প কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কোচনশীল মধ্যস্থ পিণ্ডের অনুসরণ করিতে পারে নাই; তাহারাই যেন আজও ধূমকেতুরূপে বর্ত্তমান। বস্তুতঃ অধিকাংশ ধূমকেতুই সৌরজগতের মেরুদেশ হইতে আসে; যে তলে গ্রহগণ অবস্থিত, ধূমকেতুদের পথ প্রায় তদুপরি লম্বভাবে বর্ত্তমান।

অগণিত উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া ধূমকেতুগণের মত নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরে; নবেম্বর মাসে পৃথিবী এইরূপ একটি উল্কাপুঞ্জের পথসন্নিহিত হওয়ায় সেই সময়ে উল্কাবর্ষণ হয়। উল্কার সংখ্যা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। হিসাব করিলে প্রতি রাত্রে দূরবীক্ষণ দ্বারা চল্লিশ কোটি পিণ্ড দেখা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই পার্থিব উপকরণে নির্ম্মিত; ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জে বেশী পার্থক্য নাই; বস্তুতঃ কোন কোন ধূমকেতু এইরূপ অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের সমবায় মাত্র।

দূরবীক্ষণে যে দুইকোটি তারকা দেখা যায়, তন্মধ্যে এক কোটি আশীলক্ষ ছায়াপথের অন্তর্গত; অবশিষ্ট বিশলক্ষমাত্র

* সম্প্রতি এই মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ঘনীভবন কালে উপগ্রহচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যচিত্রিত জগতের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে।

স্পেন্সারের মতে বিকাশের ন্যায় বিনাশও বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। বিকাশ ও বিনাশ সর্ব্বত্র যুগপৎ চলিতেছে; তবে বিনাশাপেক্ষা বিকাশের প্রাবল্যে বিকাশাবস্থা ও বিকাশাপেক্ষা বিনাশের প্রাবল্যে বিনাশাবস্থা বলা যায়। চন্দ্রাদিতে বিকাশাবস্থার শেষ হইলেও সাধারণ সৌরজগতে এখনও বিকাশেরই প্রাধান্য। বিকাশাবস্থার যেখানে পরিণতি, বিনাশাবস্থার সেইখানে আরম্ভ। সকলই, এই সমগ্র জগতই এই নিয়মের অধীন; এই জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইতি মধ্যেই স্থানে স্থানে বিনাশ আরম্ভ হইয়াছে।

চন্দ্র ক্ষুদ্রতাবশতঃ কঠিন হইয়াছে; চন্দ্র এখন নির্জীব ও মৃত; চন্দ্রের বিকাশাবস্থা শেষ হইয়াছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর আজিও উষ্ণ; উপরিভাগে আজিও তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ বিদ্যমান; পৃথিবীর আজিও বিকাশ চলিতেছে; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইতেছে; তাপবিকিরণ প্রযুক্ত সঙ্কোচনে আজিও মহাদেশ, পর্ব্বত গঠিত হইতেছে।

সূর্য্যও এই নিয়মের অধীন; সূর্য্য ক্রমেই ঘন হইতেছে; যখন ঘনীভবন শেষ হইবে, সূর্য্যের বিকাশেরও তখন শেষ হইবে; সূর্য্য আর তেজ দিবে না, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইবে; জগতের প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। কতকগুলি তারকা ইতি মধ্যেই নির্ব্বাপিত; সূর্য্যেরও নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী।

জগতের ভবিষ্যৎ কি? কতিপয় দীপ্তিহীন জীবহীন পিণ্ড কি চিরকাল শূন্যপথে ভ্রমিবে? মনে কর, পৃথিবী সূর্য্যে পড়িল; পতন-সংঘর্ষে তাপোদ্ভব অনিবার্য্য। সর উইলিয়ম টমসনের গণনায়

সমুদয় গ্রহের পতনে যে তাপ উদ্ভূত হইবে, তাহাতে ৪৬০০০ বৎসর কাল সূর্য্যের তেজ বর্ত্তমান ভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে। তার পর? তার পর, সূর্য্যে সূর্য্যে সংঘর্ষণ। তজ্জনিত তাপের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে; সেই তাপে আবার সূর্য্য দুইটিই বাষ্পীভূত হইবে, আবার নীহারিকা অবস্থা ধারণ করিয়া আকাশক্ষেত্র ব্যাপ্ত করিবে; এইখানে বিনাশাবস্থার পরিণতি।

এই যে মহাকায় সূর্য্যগণ মহাবেগে অনন্ত আকাশে ভ্রমমাণ, যাহাদের লইয়া জগতের এই শোভা, জগতের এই সৌন্দর্য্য, জগতের এই জীবন, তাহারা সকলেই হয়ত কালক্রমে পরস্পরে আঘাতে চূর্ণীকৃত ও বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। সৃষ্টির আরম্ভে অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া জড়পরমাণু আস্তীর্ণ দেখিয়াছিলাম; সৃষ্টির অন্তে (?) আবার সেই জড়পরমাণু মহাকাশে সমাকীর্ণ দেখিতে পাইতেছি। মহাকাশ ব্যাপিয়া জড়ের এই মহাশরীর; মহাকাল ব্যাপিয়া জড়ের এই পরমায়ু। মনুষ্যের অগোচর কত জগৎ যে মহাকাশে রহিয়াছে কে বলিবে! মহাকালে কতবার এই বিবর্ত্তন চলিবে কে বলিবে! আমাদের জগৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের এক বালুকণা; আমাদের জগতের বিবর্ত্তনকাল মহাকালের এক নিমেষ। মানবের বুদ্ধি এইখানে পরাহত; মানবের কল্পনা এখানে স্তম্ভিত। বিজ্ঞান তাহার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে ধরিয়া ধীরপদবিক্ষেপে ভীতচিত্তে এই মহাদৃশ্যের সম্মুখীন হয়; নিবিড় তিমিররাশির অভ্যন্তরে, ঘোর নীরবতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একাকী এই মহাপটে তাহার ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আকাশ-তরঙ্গ।

আকাশ-তরঙ্গ ঘটিত কয়েকটি নূতন আবিষ্কার বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। বিশ বৎসর হইল মহামতি ক্লার্ক মাক্সবেল জ্ঞানচক্ষে জড়জগতের এই অদ্ভুত রহস্য দেখিয়া যান। তিন বৎসর হইল জর্ম্মনি দেশের হার্টজ সাহেব তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাগতিক ক্রিয়াপ্রণালীর অনেক তথ্য বাহির হইয়াছে; কিন্তু এত বড় তথ্য বুঝি আর বাহির হয় নাই। পরিতাপ যে মাক্সবেল আজ বর্ত্তমান নাই।

আলোক বুঝিতে গিয়া ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা "আকাশ" নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের বাঙ্গালায় আমরা আকাশ বসাইতে পারি। তবে সে কালের আকাশ একটা কল্পনাপ্রসূত দ্রব্য; আর একালের আকাশের অস্তিত্বে বড় একটা সন্দেহ নাই। অন্ততঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘর বাড়ী হাতী ঘোড়া গাছপালা যে অর্থে অস্তি, এই আকাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও সেই অর্থে অস্তি। নাস্তি বলিবার বড় উপায় নাই। তবে আকাশের সকল গুণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই; কিন্তু কোন পদার্থেরই বা সকল গুণ আমরা অবগত আছি?

এই আকাশের একটা গুণ এই যে, ইহা নাই এমন জায়গা নাই। শূন্য স্থলেত আছেই; তা ছাড়া জল বায়ু সোণা রূপা মাটী পাথর সকল জড়পদার্থেরই অভ্যন্তরে 'ওতপ্রো'তভাবে' জড়িত রহিয়াছে। ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহার কোন অংশ কোন রকমে একটু নাড়িয়া

দিতে পারিলে তাহার চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগন্তে বিস্তীর্ণ হয়। জল নাড়িয়া দিলে যেমন জলাশয়ের পৃষ্ঠে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয়, তার নাড়িয়া দিলে যেমন চারিদিকের বায়ুমধ্যে ঢেউ উঠিয়া প্রসারিত হয় ও শ্রুতিমধ্যে উপনীত হইয়া শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করে, তেমনি এই আকাশকে কোন রকমে নাড়িয়া দিলে ঢেউএর পর ঢেউ উঠিয়া সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে। তার বেগইবা আবার কত! এখানে ঢেউ আরম্ভ হইলে সেকণ্ডমধ্যে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরে যাইয়া সেই ঢেউগুলির ধাক্কা লাগিবে। সূর্য্যমণ্ডল যে এত দূরে আছে, প্রায় সাড়ে চারিকোটি ক্রোশ দূরে আছে, সেখানে সেই ঢেউ উঠিবামাত্র আট মিনিট মধ্যে আমাদের চোখে আসিয়া তাহার ধাক্কা লাগে। চোখে আসিয়া তাহার ধাক্কা লাগিয়া আমাদের মস্তিষ্কে নাড়া দেয়; তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে ওখানে একটা কি পদার্থ আছে, এবং সেই পদার্থটার নাম রাখিয়া দিই সূর্য্য। ঈথর বা আকাশ আছে বলিয়াই আমরা অত বড় পদার্থের অস্তিত্বের জ্ঞান পাইতেছি।

আকাশসাগরের এই ঢেউগুলি বেগে বড় প্রবল, কিন্তু আকারে বড় ছোট, এক একটি ঢেউ লম্বে বড় কম। সাগরপৃষ্ঠে বাত্যাযোগে শতাধিক হাত দীর্ঘ এক এক বিশাল তরঙ্গ উঠে; পুষ্করের জল নাড়িলে আধহাত একহাত দীর্ঘ এক একটি ঢেউ উঠিয়া থাকে; আবার অগভীর জলের উপর মৃদুবায়ুহিল্লোলে হয়ত এক আধইঞ্চি লম্বা, কি আরও ছোট, ঢেউ উঠে। কিন্তু আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোকজ্ঞান জন্মায়, তাহারা এক একটি এত ছোট যে, জলের ঢেউএর সহিত তাহার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে আর ইঞ্চিতে চলেনা; ইঞ্চিকে কোটিভাগ করিতে হয়। এই সকল আলোকজনক ঢেউএর দৈর্ঘ্য কত, তাহা এক রকম মাপিয়া ঠিক্ করা

হইয়াছে। গজকাঠি দিয়া কাপড় মাপিলে তাহাতে যেমন বড় ভুল হয় না, এ মাপেও তেমনি বড় ভুল নাই; বরং এ মাপ তার চেয়েও সূক্ষ্ম। ঢেউগুলি এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যে সাধারণ ইঞ্চির মাপ এখানে খাটে না; ইঞ্চিকে কোটিভাগ করিয়া মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। ইহারই মধ্যে যে ঢেউগুলি একটু লম্বা, তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখে ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হল্‌দে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল আলো দেয়। আরও ছোট হইলে আমরা বেগুনি রঙ দেখি। তার ছোট হইলে আর চোখে অনুভব করিতে পারিনা।

আকাশের ঢেউ আসিয়া চোখে লাগিয়া মস্তিষ্কে নাড়া দিলে আলোর অনুভব হয়, আর সেই ঢেউগুলি অতি ক্ষুদ্র, এসকল আলোকবিজ্ঞানের পুরাণো কথা। ঐগুলি অনেকের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু আকাশেই যে আবার দুই হাত দশ হাত লম্বা, এমন কি দু'ক্রোশ দশক্রোশ লম্বা ঢেউ উঠিতে পারে, এবং সেরূপ বড় বড় ঢেউ অনবরত উঠিতেছে চলিতেছে, আমরা তাহার অস্তিত্ব ঘুণাক্ষরেও অনুভব করি না; একথা এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই জানিতেন না। মাক্সবেল প্রথমে ইহার সম্ভাবনা প্রমাণ করেন, কিন্তু উহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া যান নাই। সম্প্রতি হার্টজ ও তাঁহার পরবর্ত্তীদের কল্যাণে স্কুলের বালকেরাও প্রকৃতির এই রহস্যব্যাপার উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে, এবং কয়েক বর্ষ মধ্যে হয়ত আমরাই এখনকার এই বেওয়ারিশ শক্তিসমষ্টিকে আমাদের সম্পত্তিগত করিয়া সংসারকার্য্যে নিয়োজিত করিব ও তাহাতে স্বত্ব লইয়া পরস্পর ঝগড়া করিব।

রহস্যটি এই। তাড়িতশক্তি ও চৌম্বকশক্তি, যে দুইটা লইয়া আমরা আজ কাল এত কাণ্ড করিতেছি, এ দুইটাও আলোকের মত সেই একই আকাশেরই ক্রিয়াবিশেষমাত্র। তাড়িতশক্তির নাম করিলেই পাঠকের মনে কাচ গালা তামা দস্তা এবং টেলিগ্রাফ ও তাহার আনুষঙ্গিক দুর্ব্বোধ্য জটিল যন্ত্রপরম্পরার উদয় হইতে পারে। এসব যেন সাধারণের আলোচ্য নহে, কোনরূপ ভেলকির ব্যাপার, ইহা স্বতই মনে আসে। কিন্তু সেরূপ ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নাই। তাড়িতের উদ্ভব আমরা সচরাচর দেখিতে পাই; কোন বিকট যন্ত্র বা তন্ত্রমন্ত্রের দরকার হয়না। সচরাচর ব্যবহৃত রবরের চিরুণী লইয়া যত বার চুল আঁচড়াই, চিরুণীর গায়ে তত বারই তাড়িতভাবের বিকাশ হয়। চুলে আঁচড় দিয়া টুকরা কাগজের উপর ধরিলেই কাগজের টুকরা গুলি লাফাইয়া চিরুণীর গায়ে লাগিতে আসে। একটা বিড়ালের গায়ে চাপড় মারিলেই হাত তখনই তাড়িতধর্ম্মযুক্ত হয়। শুধু কাচ আর রেশম কেন, যে কোন দুইটি দ্রব্যকে গায়ে গায়ে ঘর্ষণ করিলেই দুইটিরই গায়ে তাড়িতের বিকাশ হয়; তবে দ্রব্যবিশেষে বেশী আর কম। কাজেই তাড়িতের বিকাশ নিত্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের উঠিতে বসিতে, কাপড় পরিতে, প্রতি পদবিক্ষেপে তাড়িতের সঞ্চার হইতেছে, আমরা তাহার কোন খোঁজ রাখি না। আবার চৌম্বক শক্তির নামোল্লেখেই কম্পাসের কাঁটা, ডাক্তারদের ব্যাটারি ও বড় বড় ডাইনামো মেশিন মনে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমাত্রই, ছোট বড় চুম্বক, তবে প্রবল আর দুর্ব্বল।

এই তাড়িত ও চৌম্বকশক্তি কি, এতদিন তাহার বড় ঠিক্ ছিল না। মাক্সবেল তাহা স্থির করেন। ঈথর বা আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; ইস্পাতের স্প্রিং বা রবরের সূতা যেমন জিনিষ, কতকটা সেই

গোছের। টানিয়া ধরিতে জোর লাগে, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্বের অবস্থা পায়। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা একবারে পায়না। স্প্রিংটি টানিয়া ছাড়িলেই বারকত ঘন ঘন দুলিতে থাকে, এবং দুলিতে দুলিতে অবশেষে থামিয়া যায়। অনেক জিনিষ আছে, যাহা স্থিতিস্থাপক নহে; যেমন নরম মাটি, নরম গালা অথবা মোম। টানিলে বাড়িয়া বা বাঁকিয়া যাইবে, ছাড়িলে দুলিবেও না, পূর্ব্বাবস্থাও পাইবে না, বাড়িয়া ও বাঁকিয়াই থাকিবে। (আকাশ কতকটা স্প্রিঙের মত; উহার কোন অংশ একটু নাড়িয়া ছাড়িলে উহা দুলিতে থাকে, এবং এইরূপ দুলিতে থাকে ও স্পন্দিত হয় বলিয়াই চারিদিকে আকাশে ঢেউ উঠে; সেই স্পন্দন ও আন্দোলন ক্রমশঃ সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হইয়া ঢেউ উৎপাদন করে। জল ও বায়ু এক অর্থে স্থিতিস্থাপক; কাজেই তাহার এক অংশের আন্দোলনে সমস্তটা আন্দোলিত হইয়া জলে তরঙ্গ ও বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক ঈথরে যখন টান পড়ে, তখনি তাড়িতশক্তির বিকাশ হয়। রবরের সূতা দুই হাতে টানিয়া ধরিলে সেই সূতার যেমন অবস্থা হয়, কাচে রেশম ঘষিয়া কাচখানি সরাইয়া লইলে, চুলে চিরুণী ঘষিয়া চিরুণী খানি সরাইলে, উভয় দ্রব্যের মাঝে, কাচ ও রেশমের মাঝে, চুল ও চিরুণীর মাঝে যে ঈথর থাকে, তাহারও কতকটা সেইরূপ অবস্থা হয়। যে দ্রব্যে তাড়িতভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহার পাশের ও চারি-দিকের আকাশে যেন টান পড়িয়াছে। রবরের সূতা টানিয়া ধরায় দুই হাতে যেমন পাল্‌টা টান পড়ে, এক হাত আর এক হাতের কাছে যাইতে চায়; তেমনি মাঝের ঈথরে টান পড়ায় কাগজের টুকরাগুলি চিরুণীর দিকে বা কাচের দিকে যাইতে চায় ও লাফাইয়া উঠে।)

তবেই তাড়িতশক্তি কি রকম, কতকটা বুঝা গেল। দুইটা জিনিষ পরস্পর ঘষিয়া যত সরাইয়া লইবে, তাহাদের মাঝের আকাশেও সঙ্গে

সঙ্গে টান পড়িয়া যাইবে। হঠাৎ যদি জিনিষ দুইটি ছুঁইয়া দেওয়া যায় (একটার গায়ে আর একটা ছুঁইলে চলিতে পারে, অথবা একটা তামার তার দিয়া দুইটাকে স্পর্শ করিয়া দিলেও চলিবে,) তাহা হইলে ঈথরের টান অমনি আল্‌গা হইয়া যায়; স্প্রিংকে বা রবরকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িলে যেমন উহা কয়েকবার দুলিয়া দুলিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আইসে, সেইরূপ মাঝের ঈথরও বারকতক দুলিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা পায়। ইহাকেই ইংরাজিতে ডিশচার্জ বলে। স্প্রিং বা রবরের সূতার টান আমাদের হাতের জোর অপেক্ষা অধিক হইলে, নিজের দুই প্রান্ত যেমন হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া টান আল্‌গা করিয়া লয়, তাড়িতশক্তির টান সেইরূপ অধিক প্রবল হইলে মাঝের বাধাবিঘ্নসকল নষ্ট করিয়া আকাশের দুই প্রান্তকে যেন একত্র আনিতে চেষ্টা করে ও এইরূপে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধিক টানে স্প্রিং অথবা রবরটা যেমন ছিঁড়িয়া যায়, অধিক টানে আকাশটাও যেন সেইরূপ ছিঁড়িয়া যায়। মধ্যে বায়ু থাকিলে উহা প্রদীপ্ত হয়, কাচ থাকিলে ভাঙ্গিয়া যায়, মানুষের শরীর থাকিলে তাহাতে আঘাত লাগে। বজ্রপাতের পূর্ব্বে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ এই দুয়ের মধ্যে সমগ্র আকাশটায় ঐরূপ টান পড়ে। টান অতিরিক্ত হইলেই বায়ুস্তরের ব্যবধান ছিন্ন করিয়া ডিশচার্জ হয়, সমগ্র ঈথরটা কাঁপিয়া উঠে; কোন হতভাগ্য জীব সম্মুখে রাস্তায় পড়িলে তাহার শরীরটাও ছিঁড়িয়া যায়।

তাড়িতের বিকাশ যেমন আমাদের নড়িতে চড়িতেই হইতেছে, এই ডিশচার্জও সেইরূপ আমাদের অলক্ষিতে নিয়তই ঘটিতেছে। প্রতি ডিশচার্জেই খানিকটা ঈথর স্প্রিঙের মত দুলিয়া উঠে, এবং খানিকটা দুলিলেই সেই আন্দোলন চারিদিকে আকাশসাগরে সংক্রামিত ও ব্যাপ্ত হয়। সুতরাং প্রতি ডিশচার্জেই ঈথরে ঢেউ উঠিতেছে। এই ঢেউগুলি

নিতান্ত ছোট নহে। জড়পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুগুলি নড়িয়া ঈথরে ধাক্কা দিলে যে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া আলোক উৎপাদন করে, এই সব তাড়িত ডিশচার্জের ঢেউ অবশ্য দৈর্ঘ্যের হিসাবে তাহার সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। এই সব তরঙ্গ মাপিলে দেখিতে পাইবে কেহ এত হাত কেহ বা এত মাইল; আর আলোক তরঙ্গের বেলায় বলিতে হইবে উহা এক ইঞ্চির কোটিভাগের এত ভাগ।

কথাটা এই। আকাশে ছোট বড়, অতি ছোট হইতে অতি বড় পর্য্যন্ত, ঢেউ প্রায় নিয়তই উঠিতেছে। আকাশে কোন রকমে টান বা আঘাত পড়িলেই এই সব ঢেউ উৎপন্ন হইয়া প্রবল বেগে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যে সকল ক্ষুদ্র উর্ম্মি উঠে, সেইগুলি—তাহারও সকলে নহে, কতকগুলি মাত্র—আমাদের চক্ষুরূপ সুকৌশল যন্ত্রযোগে মস্তিষ্কে ধাক্কা দিয়া দূরস্থ পদার্থের খবর দেয়। আর সমুদয় ছোট বড় উর্ম্মি, যত মাইল বা যত ইঞ্চি দীর্ঘ হউক, আমাদের শরীর ভেদ করিয়া নিয়ত চলিয়া গেলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের অভাবে আমরা তাহাদের যাতায়াত বা অস্তিত্ব অনুভব করিনা। প্রকৃতই তাহারা এত কাল আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

মাক্সবেলই প্রথমে স্থির করেন যে, যে ঈথরে ঢেউ উঠিলে আলোক হয়, সেই ঈথরেই কোনরূপ টান পড়িলে তাড়িতভাবের আবির্ভাব হয়; সেই ঈথরেই কোনরূপ ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উপস্থিত হইলে চুম্বক জন্মে; এবং ঈথর যখন স্প্রিঙের মত, তখন সেই তাড়িতভাব লোপের সময় অর্থাৎ ডিশচার্জের সময় বড় বড় ঢেউ উঠিবারও সম্ভাবনা। জর্ম্মণ অধ্যাপক হার্টজ কৌশলক্রমে তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব সাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। একফুট দীর্ঘ একইঞ্চি পুরু পিত্তলদণ্ডকে

তড়িৎযুক্ত করিয়া ডিশচার্জ করিলে চারিদিকের ঈথরে যে ঢেউ উঠে; তাহা প্রায় একহাত লম্বা। কাচের বোতলের ভিতর ও বাহির পাতলা টিনের রাংতায় মুড়িয়া যে তড়িৎসঞ্চয়ের যন্ত্র সচরাচর প্রস্তুত হয়, ইংরাজীতে যাহাকে লীডেনজার বলে, তাহা ডিশচার্জ করিলে আরও বড় বড় ঢেউ উঠে। আমাদের চিরপরিচিত আলোকরেখার রশ্মিগুলি যেমন মসৃণ পদার্থের পিঠে পড়িয়া প্রতিফলিত হয় বা ফিরিয়া আইসে, স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়া বিবর্ত্তিত হয় বা বাঁকিয়া যায়; হার্টজ কৌশলক্রমে দেখাইয়াছেন, এই নবাবিষ্কৃত দীর্ঘ ঊর্ম্মির রশ্মিও সেইরূপ প্রতিফলিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আলোকের মত তাড়িত রশ্মিও আকাশপথে সেকণ্ডে প্রায় কোটি ক্রোশ বেগে ধাবিত হয়। ফলে আলোকের রশ্মিতে যে যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান, এই নবাবিষ্কৃত তাড়িত-রশ্মিতেও সেই সমুদয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পৃথিবীর বয়স।

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার সন্তানসন্ততিবর্গের মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিলনা, সেইজন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতাপ্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। কেশের পক্কতার প্রাচুর্য্য ও চর্ম্মের লোলতার পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাটরেখামাত্র দর্শনে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালীন রাশি নক্ষত্রলগ্নাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয় এই পদ্ধতিরই কোনরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয়হাজার বৎসরমাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত প্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসেনা। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতাবিচারে আমাদিগের অধিকার নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজনামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা

ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপরে ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত; একদল বলেন মাতাঠাকুরাণীর বয়সে গাছপাথর নাই। আর একদল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে ত কালকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এইত সে দিন জননীর জন্য স্থতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, স্থতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের সমাবেশ কিরূপ আছে তাহা ঠিক্ জানি না; তবে ভিতরটা বড় গরম; এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয়টা চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গিরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য ছেলেপিলের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক উপরের চর্ম্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ডগুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়;—কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু হায় সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাইভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে

প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে বাহির হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এক কালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকারপ্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত তফাত! তাহারাও আমাদের মত জীবধর্ম্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির সমাবেশে একটা পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে, ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যকালের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরপ্রদেশে নীলনদমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত কোটি নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অল-ক্ষিত ভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে, অতি প্রাচীন কালেও

যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালী-ক্রমেই স্তরের উপরে স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষফুট স্থূল কঠিন চর্ম্মখানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক-সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নদনদী মাটি আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইয়া উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃণ্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথরকয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথরকয়লার স্তর দেখা যায়, এবং স্থানে স্থানে এই রূপ দুইশত আড়াইশত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথরকয়লার একফুট স্তর জন্মে; মনে কর এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা হইলে একফুট স্তর জমিতে পাঁচশ

বৎসর লাগে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাটিলাখ বৎসরের অধিক সময় অহিবাহিত হয়।

মনে রাখিও পাথরকয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত।

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিরুদ্বেগে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তরনির্ম্মাণে দশবিশকোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননা।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণতি পাইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন প্রণালী বিচারসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষবৎসরমধ্যে মনুষ্য-শরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে কর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তিব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে।

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল, যে বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার আজিকার মতই ধীরভাবে চলিতেছে; এবং বিগত কোটি কোটি কোটি বৎসরমধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি

হইয়াছে। অর্থাৎ কিনা, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূলকিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে বিখ্যাত সার উইলিয়ম টমসন (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে,—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিলমাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখনও যে সেই ভাবে স্তরনির্ম্মাণ চলিত, তাহা বলা যায়না। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথম, সম্প্রতি পৃথিবী একদিনে এক পাক আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে ঘুরিতেছে; আর চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জল রাশিকে আপনার দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়ে। এই জলরাশির বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধমুখে পৃথিবীকে ঘুরিতে হইতেছে। যেন একখানি চাকা বেগে ঘুরিতেছে; আর তাহার পরিধিতে একখণ্ড কাঠ সংলগ্ন থাকিয়া সেই আবর্ত্তনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ব্যাঘাতের ফলে আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরেই আবর্ত্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, একপাক আবর্ত্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অহোরাত্রের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্ত্তনের

বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্রকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বেগ বর্ত্তমান বেগের দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় রাত্রিদিন হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় রাত্রিদিন হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত আজিকার অবস্থার কোন তুলনা হইতে পারেনা; ভূতত্ত্ববিদেরা যে এক নিঃশ্বাসে লক্ষকোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোন মূল নাই। একালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সে কালের স্তরনির্ম্মাণব্যাপারের সহিত তাহার কোন তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়, সূর্য্য পৃথিবীকে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশমাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও গতি, ও জীবের উৎপত্তি ও লীলাখেলা চলিতেছে। সূর্য্য কিছু চিরকাল ধরিয়া এই পরিমাণে তাপ দিয়া আসিতেছেনা। বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য একবারেই তাপ দিতনা। তখন সূর্য্যের তাপবিকিরণশক্তি ছিলনা। সুতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিলনা, নদনদীও ছিলনা; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়, পৃথিবী একটা তপ্ত পিণ্ডমাত্র। কেবল উহার উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর বৎসর কত তাপ খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্ দিন পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে, গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীত কালে, অন্ততঃ কয়েক কোটি বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর কখন্ কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে

পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশকোটি কি জোর বিশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল, যে তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরলাবস্থ ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট্ সাহেবের গণনায় এই কাল দশ বিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্তও উঠে না। তিনি দুই এক কোটি বৎসরের উর্দ্ধে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই। পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল। কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয়ত কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্য্যায়ে উন্নতি ও বিকাশ, এই সমুদয় ব্যাপার হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়,তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসবমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল, যে তখন জীবনিবাস সম্ভব হয় নাই। হয়ত সূর্য্য হইতে সম্যক্‌পরিমাণ তাপও তখন আসিত না। হয়ত পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ তখন এত প্রবল ছিল,যে এ কালের দিবারাত্রি ঋতু পরিবর্ত্তনাদির সহিত সে কালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের এক খানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশবিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবী অগ্রাহ্য।

আচার্য্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিদের ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজী ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তরের পরদা জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়পরতা হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া জমিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে; এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যার পক্ষেও এই পরিমিত কালের অধিক দাবী করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বিবিধ প্রাণী ও বিবিধ উদ্ভিদের বিকাশ ঘটিয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা; কেলবিনের বিচারপ্রণালীতে কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৎপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি তাঁহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজী। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই, অথবা সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফস্তূপের আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সরিয়া গেলেই, পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগে এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ সময়ে জলস্থলের বা জলবরফের সমাবেশ কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্ত্তন বেগসম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছিলেন। তার পর সূর্য্যের অবস্থাসম্বন্ধে এবং সূর্য্যকর্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম; কেলবিন স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বকীয় সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ বিকিরণ করিতনা, নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশটা আমাদের পরিচিত; কিন্তু

উহার আভ্যন্তরিক অবস্থাবিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপ পরিচালন ক্ষমতা কিরূপ, এবং উষ্ণতাসহকারে তাহাদের তাপপরিচালনক্ষমতা বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লর্ড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন যেথানে দশকোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয়ত সে স্থলে পঞ্চাশকোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ভূবিদ্যাবিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত একটা শালিসী বন্দোবস্ত করিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

জ্ঞানের সীমানা।

গত শত বৎসরে জ্ঞানের পরিধি এত বিপুল পরিসর লাভ করিয়াছে যে, এই প্রসারে অতি সুধীর ব্যক্তিকেও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ ভাবেন, মানুষের জানিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই; কেহ ভাবেন, এমন স্থান নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধি প্রবেশলাভে অসমর্থ; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি অতি শীঘ্র মানুষের বিজয়লব্ধ জ্ঞান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল; শীঘ্রই বুঝি মানুষকে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের মত অর্জিত ভূমির অভাব দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে হইবে। গত কতিপয় বৎসরে মানুষের জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রভাবে ও প্রবীণতায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিজ্ঞানরাজ্যে গরীয়সী। নিউটনের অলৌকিক ধীশক্তি সৌরজগতের জটিল শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; গ্রহ বল, উপগ্রহ বল, ধূমকেতু বল, আর সমবেত উল্কাস্রোত বল সৌরজগতে এমন কিছুই নাই, যাহার গতায়াত জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় না আইসে। দূরবীণে দেখিবার আগে গণনাবলে নেপচুনের আবিষ্কার হইয়াছে। দূরবীণ যাহা কখন দেখিবে না, এমন নির্ব্বাপিত নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন্ গ্রহ কতদূরে আছে, গণিতে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না। গ্রহদের কথা ছাড়িয়া দাও; আলোর বেগ সেকণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ হিসাবে ধরিয়া, যে সকল নক্ষত্র হইতে আলো আসিতে বিশ বৎসর কি ত্রিশ বৎসর লাগে, তাহাদের দূরত্বও একরূপ পরিমিত হইয়াছে। আমাদের নক্ষত্রজগৎ, যাহাতে দূর-বীক্ষণযোগে দৃষ্টিগোচর নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি, তাহার আকৃতি ও অবয়ব ও আয়তন একরূপ মোটামুটি স্থির হইয়াছে। বলা বাহুল্য

আমাদের এত বড় সূর্য্য এই দুইকোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি ছোট খাট নক্ষত্রমাত্র। একটা নক্ষত্র হইতে তাহার খুব কাছের নক্ষত্রে আলো আসিতে মোটামুটি দুই তিন বৎসর অতীত হয়। বুঝিয়া লও, এই নক্ষত্র-জগৎ কত বিশাল। তথাপি এই দৃশ্যমান জগতের আয়তন ও পরিধি ও সীমা একরূপ স্থির হইয়াছে।

আমাদের দুইকোটি সূর্য্যের মধ্যে কোন্‌টির গঠন কিরূপ, কোন্‌টিতে লোহা আছে, কোন্‌টিতে তামা আছে, কোন্‌টিতে দস্তা আছে, আলোকবিশ্লেষণযন্ত্র দিন দিন তাহার নূতন নূতন খবর আনিয়া দিতেছে। রয়টরের প্রেরিত তারের খবরে ভুল থাকে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির কাচ কয়খানায় যে সংবাদ আনিয়া দেয়, তাহা অভ্রান্ত সত্য। শুধু তাহাই নহে, আবার সূর্য্যমণ্ডলের কোন্‌খানে কোন্ মুহূর্ত্তে কত বেগে ঝড় বহিতেছে; অমুক নক্ষত্র ঘণ্টায় কত ক্রোশ বেগে আমাদের নিকট আসিতেছে বা দূরে যাইতেছে; অমুক নক্ষত্র দূরবীণের কাছে একটা দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা দুইটা সহচর, পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অমুক নক্ষত্রে অকস্মাৎ উদজান বাষ্প জ্বলিয়া উঠিয়া হঠাৎ মহাপ্রলয় হইয়া গেল; হয়ত আমাদের মত কত সসাগরা সদ্বীপা সমানুষা ধরিত্রী একবারে বাষ্পীভূত হইয়া গেল; এইরূপ কত না কত সংবাদ নিত্য নিত্য এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি আনিয়া দিতেছে।

নিউটনের কল্যাণে জগতের স্থিতির ও গতির ব্যবস্থা জানিয়াছি; হর্শেল হইতে আকৃতি, অবয়ব ও আয়তন পাওয়া গিয়াছে; কির্কফের পর হইতে গঠন ও উপাদান ক্রমেই বিবৃত হইতেছে; এখন জগতের জীবনের ইতিহাস লইয়া কথা। লর্ড কেলবিনের ধীশক্তি পৃথিবীর ও সূর্য্যমণ্ডলের বয়সনিরূপণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোষ্ঠীগণনা অদ্যাপি সম্পন্ন হয় নাই বটে; কিন্তু আচার্য্যমহোদয়েরা গণনার সঙ্কেত[illegible] করিয়াছেন।

দুনার, লকিয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বয়স অনুসারে নক্ষত্রগণের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। লাপ্লাসের পন্থানুবর্ত্তী হইয়া হেলমহোলৎজ জগতের ভ্রূণদশা হইতে আনুক্রমিক অঙ্গবিকাশ এবং শক্তিসঞ্চার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং কেলবিন জগতের অন্তিম দশায় প্রলয়কালের ছবি আঁকিয়া মানুষের গর্ব্ব স্তম্ভিত করিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল এককালে পৃথিবীর কুক্ষিতে নিহিত ছিল; ভূমণ্ডলও বুধশুক্রশনৈশ্চর প্রভৃতির সহিত সূর্য্যমণ্ডলের অঙ্গীভূত ছিল; সূর্য্যমণ্ডল আপনার কলেবর সৌরজগতের দূরসীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া হয়ত বাষ্পাকারে বিস্তীর্ণ ছিল; এবং বিশ্বজগতের সমগ্র নক্ষত্রচয় হয়ত এক বাষ্পময় মহাসাগরের মত বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। সেই বাষ্পময় মহাসাগর কালক্রমে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ঘনীভূত হইয়া এই দৃশ্যমান জগৎ প্রস্তুত করিয়াছে। সন্দেহ নাই, কালক্রমে সূর্য্যমণ্ডল নিবিয়া যাইবে; যে কয়কোটি সূর্য্য দূরবীক্ষণের গোচর হয়, এক এক করিয়া সকলেই নিবিবে; এবং হয়ত সূর্য্যে সূর্য্যে সংঘর্ষ হইয়া পরিশেষে এক বাষ্পময় মহাসাগর বিশ্ব ব্যাপিবে, অথবা একমাত্র শীতল মহাপিণ্ডরূপে আকাশে অবস্থান করিবে। পরিণাম কিরূপ তাহা এখনও স্থির বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্যকে যে চিরকাল বিজ্ঞানের বিজয়দুন্দুভি বাজাইতে হইবেনা, ইহা ধ্রুব সত্য।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা হইতে সাধারণ পদার্থতত্ত্বে আসিলে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে এই শাস্ত্র অকল্পিত বেগে প্রসার পাইয়াছে। আলোকের বেগ পরিমিত হইয়াছে। আলোকবাহী বিশ্বব্যাপী ঈথরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিগুলির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; লাল আলো সেকণ্ডে কত কোটিবার চক্ষুর পুরদায় আঘাত দেয়, সবুজ আলো কতবার দেয়, অতি বড় অর্ব্বাচীনও গণিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তাপের সহিত আলোর সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত

হইয়াছে, জড়পরমাণুর স্পন্দনসংখ্যা গণিত হইয়াছে। বাষ্পীয় পদার্থের অণুসকলের অনিয়ত অসংযত যথেচ্ছ গতির বেগ পর্য্যন্ত পরিমিত হইয়াছে।

মেন্দেলজেফ সত্তরশ্রেণীর মূল পদার্থের সম্বন্ধনির্ণয়ের পথ দেখাইয়াছেন; কেলবিনের প্রতিভা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জড়পরমাণুর আয়তনপরিমাণে অগ্রসর হইয়া সফলকাম হইয়াছে; ফ্যারাডে রহস্যের পর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া একদিকে তড়িৎশক্তিকে মানুষের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, অপরদিকে তীক্ষ্ণ ব্যবচ্ছেদছুরিকা চালাইয়া প্রকৃতির শরীরসংস্থান জ্ঞানদৃষ্টির গোচরে আনিয়াছেন। মনস্বী ক্লার্ক মাক্সবেলের বুদ্ধি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে প্রতিহত হইয়াও অবশেষে আলো, তড়িৎ ও চুম্বকশক্তির সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে। অধ্যাপক হার্টজ ঈথরমধ্যে ক্রোশবিস্তারী আলোক-উর্ম্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রতিভার সমরক্ষেত্রে মাক্সবেলের বিজয়নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন।

পদার্থবিদ্যার পর জীববিদ্যা। জীবশরীরের যে সমস্ত ক্রিয়াসমষ্টিকে জীবন বা প্রাণ বলি, তাহা কেবল জড়শক্তিরই বিকাশমাত্র। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, তড়িৎ ও আলো, প্রভৃতি জড়শক্তিরই সুনিয়ত ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা সমগ্র জীবনী ক্রিয়া বুঝান যাইতে পারে ও বুঝান যাইবে, এ বিষয়ে সংশয়প্রকাশ আজিকার দিনে ধৃষ্টতামাত্র। জড়ের ও জীবের মধ্যে কেহ কেহ যে ব্যবধান দেখিতে পান, সে প্রকৃত ব্যবধান নহে, তাঁহাদেরই দৃষ্টিবিভ্রম ও মনশ্চক্ষুর কুয়াসামাত্র। বৈজ্ঞানিক এই মায়াময় ব্যবধান সম্মুখে দেখিয়া কখনই সত্যমার্গ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

জীবতত্ত্ব উদ্ভিদে উদ্ভিদে, জীবে উদ্ভিদে, জীবে জীবে সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে; প্রত্যেককে জীবসাধারণের বংশানুক্রম-তালিকায় উচিত পর্য্যায়ে স্থান দিতেছে; অভিব্যক্তির পরম্পরায় প্রত্যেক জাতির উদ্ভবের

প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছে। বহিঃপ্রকৃতি হইতে জীবকোষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই জীবকোষের জীবনের উদ্দেশ্য; বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ জড়শক্তি নিচয়ের তদনুযায়ী সামঞ্জস্যপ্রয়াসই জীবন; সেই সামঞ্জস্যের অপচয়ই মৃত্যু; জীবকোষের সমবেত জীবনই জীবের জীবন; জীবনরক্ষার প্রয়াসে শরীরমধ্যে অঙ্গবিভাগ ও অবয়ববিভাগ; জীবনরক্ষার প্রয়াসেই আত্মপুষ্টি; আত্মপুষ্টিরই পরিণতিক্রমে বা প্রকারভেদে বংশপুষ্টি বা সন্তানোৎপাদন; ব্যক্তিগত জীবনরক্ষার প্রয়াস-ফলেই জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ ও বর্ণভেদের উদ্ভব; জীবনরক্ষার উপযোগিতায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, ও অনুপযোগিতায় অপকর্ষ; জীবন-যুদ্ধে বিজয়চেষ্টার ফলে জাতিগত অভিব্যক্তি। বৃক্ষের কাণ্ডের পরিণতিতে শাখা, শাখার পরিণতি পত্র, পত্রের সমবায় পুষ্প, পরিণত পত্রই বীজ; জাতীয় পরিপুষ্টি বা বংশবৃদ্ধি ব্যক্তিগত পুষ্টি বা আহারক্রিয়ারই অবান্তরভেদ; শাখা যেমন বৃক্ষের শরীরগত অংশ মাত্র, বীজজাত সন্তানবৃক্ষও তেমনি পিতৃবৃক্ষের অংশভূত, উভয়ত্র সম্বন্ধ একরূপ; আমার হাতপায়ের সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তোমার সহিত বা আমার পালিত কুকুরের সহিত, অথবা আমার খাদ্যভূত মৎস্যটির সহিতও আমার তাদৃশ সম্বন্ধ; অথবা আমি ও তুমি, কুকুরটি ও মাছটি সকলেই একমাত্র জীবের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র। এ সকল কাব্য নহে, কল্পনা নহে, বাক্যালঙ্কার নহে, শুদ্ধ জ্ঞান। স্ত্রীপুরুষভেদ স্বভাবের নিয়ম নহে, স্ত্রীপুরুষভেদ সৃষ্টিরক্ষার একমাত্র উপায় নহে; ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী বা ব্যক্তিমাত্রই পুরুষ, অথবা ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ; কাহারও স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই অবিকশিত; কাহারও বা উভয়ভাবই সমানপরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত; কোন ব্যক্তিতে স্ত্রীভাব পুরুষত্বে লীন, কোন ব্যক্তিতে পুরুষত্ব স্ত্রীভাবে আচ্ছাদিত।

মৃত্যু স্বভাবের ধর্ম্ম নহে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, জাতীয় জীবন বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিজীবনের উপার্জ্জিত, ব্যক্তিজীবনে অভিব্যক্ত ধর্ম্মমাত্র। জীবনরক্ষার জন্য আত্মানুরাগ বা স্বার্থবৃত্তি; জাতীয় জীবনরক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার সন্তানস্নেহ; জাতির সহিত জাতির জীবন—যুদ্ধে আবশ্যক বলিয়া পরানুরাগ ও স্বার্থত্যাগ। এই হইতে স্নেহমমতা, এই হইতে সামাজিকতা, এই হইতে সমাজশাসন, এই হইতে ধর্ম্মভয়। জীবতত্ত্ব জীবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়া সমাজতত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছে; মনোবিজ্ঞান গঠিত করিবার উপায় দেখাইয়াছে; নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

শক্তির অনশ্বরতা প্রতিপাদন যেমন পদার্থবিদ্যায়, জীবনের অনাদিত্ব ও অনশ্বরত্ব প্রতিপাদন তেমনি জীববিদ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রধান কীর্ত্তি। পদার্থবিদ্যায় যেমন হেলমহোলৎজ ও কেলবিন ও মাক্সবেল, জীববিদ্যায় তেমনি ডারুইন। ইঁহাদের তুলনা নাই। মনুষ্যজাতি চিরদিন ইঁহাদের অক্ষয় যশ গান করিবে। মনুষ্যজাতি যতদিন, এই যশের সঙ্গীত ততদিন থামিবেনা।

জীববিদ্যার পর সমাজবিদ্যা। সমাজ শরীরী পদার্থ, অগষ্ট কোম্ত তাহা অস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন; হর্বার্ট স্পেনসার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া জীববিদ্যার উপর সমাজবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ সমাজবিদ্যা জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয় বিদ্যাই ডারুইনের প্রতিভার নিকট সমান ঋণী। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন বা স্থিতি, অযোগ্যের বিনাশ বা লয়; এই মূলসূত্র স্থাপন করিলেই জীববিদ্যার প্রধান কথা বলা হইল; সমাজবিদ্যারও মূল কথা ও প্রধান কথাও শেষ হইল। সুতরাং ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, যাহা কিছু সমাজবিদ্যার শাখাভূত, সকলেরই ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। বলা বাহুল্য

ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র; গাঁথিতে এখনও বাকী আছে; ভরসা আছে, অচিরে সৌষ্ঠবশালী অট্টালিকা মনুষ্যের চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। ধর্ম্মনীতি সমাজ-বিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া যেমন একদিকে জীববিদ্যার আশ্রিত, তেমনি আবার মনোবিজ্ঞান ইহার অন্যতর প্রধান অবলম্বন। মনোবিজ্ঞানের কথা পরে বলিব। যেদিন হইতে সমাজ, সেইদিন হইতে ধর্ম্মের আবশ্যকতা এবং সেইদিন হইতে মানুষের ধর্ম্মনীতিস্থাপনে প্রযত্ন। সুতরাং প্রাচীনতায় ধর্ম্মশাস্ত্র কোন শাস্ত্রের অধঃস্থ নহে; বুঝি ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অপেক্ষাও পুরাতন। কেননা অন্য শাস্ত্রে সমাজের উন্নতিমাত্র; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজের স্থিতি নির্ভর করে। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বদেশে মনস্বিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র স্থাপনে প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া সম্প্রদায়বিশেষ মনোরঞ্জন সাধন করিয়াছে; কিন্তু কেহই স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। ডারুইন ডিসেণ্ট অব ম্যান অথবা মানুষের উৎপত্তি নামক গ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সূত্র বিবৃত করিয়াছেন। এখন পূর্ণতালাভ ভবিষ্যতের ভরসা।

পাপ আর পুণ্য এই দুইটি কথা লইয়া চিরকাল আন্দোলন চলিয়াছে। নানা যুক্তি, নানা গবেষণা, পাপপুণ্যের উৎপত্তির আবিষ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্ক, বিবাদ, রক্তপাত, কতই না এই তথ্য উদ্ঘাটন প্রয়াসের ফলস্বরূপ। ডারুইনের নিকট উত্তর পাইয়াছি। প্রাচীন হিন্দু উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন; বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টানধর্ম্ম উত্তর দিতে গিয়া উপহসিত হইয়াছেন। প্রাচীন গ্রীকেরা নানা মতে উত্তর দিয়াছিলেন; দুই মত কখন এক হয় নাই। ষ্টুয়ার্ট মিল একচক্ষু হইয়া স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। কথাটা বড়ই গুরুতর; এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা বিড়ম্বনা।

জীবনরক্ষার প্রয়াসে জীব পত্রপুষ্পের সৃষ্টি করিয়াছে; হাতপা মস্তিষ্কের সৃষ্টি করিয়াছে; বুদ্ধিবলসামর্থ্য প্রভৃতি স্বার্থবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছে। জাতির জীবনরক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুর সৃষ্টি, স্বার্থত্যাগবৃত্তির সৃষ্টি, স্নেহমমতা দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি পরার্থবৃত্তির ও সমাজধর্ম্মের অভিব্যক্তি। এই-রূপেই ধর্ম্মবৃত্তির উদ্ভব, পাপপুণ্যের উৎপত্তি। সনাতন ধর্ম্ম নাই, সনাতন পাপ নাই। সমাজজীবন যাহাতে রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম; সমাজ-জীবন যাহাতে রক্ষা পায়না তাহাই অধর্ম্ম। সমাজজীবন রক্ষার জন্য ব্যক্তিজীবন উৎসর্গ করিতে হয়, কর। এই উৎসর্গ ধর্ম্ম; এই উৎসর্গ না করিলে পাপ হয়। ধর্ম্মসাধন কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমার সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সমাজজীবন রাখিতে হইবে; ধর্ম্মসাধন করিতেই হইবে। স্বর্গের প্রলোভন আছে; নরকের বহ্নিশিখার ভয় আছে; রাজার দণ্ড আছে; যাজকের শাসন আছে; সমাজের সাধারণী শক্তির প্রবল সংপেষণ আছে। ধর্ম্মসাধন করিতেই হইবে। কিন্তু প্রলোভনে বা নিপীড়নে ধর্ম্মসাধন করিলে তোমাকে ধার্ম্মিক বলিবনা। যশঃশ্রীলুব্ধ হইয়া বদান্য সাজিলে দাতা বলিবনা। তোমার মনোবৃত্তিসমূহ যদি আপনা হইতেই ধর্ম্মপথগামী হয়, তোমার আত্মা যদি সমাজরক্ষার অনুকূল পথে আপনা হইতে চলে, তবেই তুমি ধার্ম্মিক; কেন না ধার্ম্মিকতাই তোমার স্বভাব; ধার্ম্মিক না হইলে তোমার চলেনা; ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন তোমার আত্মা সুস্থ হয়না।

তারপর মনোবিজ্ঞান। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ ক্রমেই স্থির হইতেছে। গল সাহেবের মস্তিষ্কবিদ্যার বুজরুকির স্থল বিশুদ্ধ জ্ঞান কর্ত্তৃক ক্রমেই পূর্ণ হইতেছে। তার পর অন্তঃকরণের প্রকৃতিনির্ণয়। জড়বাদী উপহাসাস্পদ হইয়াছে; আত্মবাদীর মিথ্যা জল্পনা নিরস্ত হইতে চলিয়াছে। বার্কলি, হিউম এবং ক্যাণ্টের স্থাপিত ভিত্তিকে আচার্য্য হেলমহোলৎজ্

পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যলব্ধ মশলা দিয়া জমাট বাঁধিয়া দৃঢ় করিয়াছেন। মন কি তাহা জানিনা; আবার জড় কি তাহাও জানিনা। বিজ্ঞান নিজের অজ্ঞান স্বীকার করিয়া তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। একই পদার্থের দুই ভাব; একদিকে জড়ত্ব, অন্যদিকে চৈতন্য। সঙ্কেত লইয়া কারবার। টেলিগ্রাফের কেরাণী যেমন সঙ্কেত লইয়া কারবার করে, বিদেশের বন্ধুর মনের কথা টানিয়া আনে, চৈতন্য তেমনি কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া কারবার চালাইতেছে। জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, আমি যথা নিযুক্তবৎ করিতেছি। জড়জগৎ আছে কি নাই, মহাসমস্যা।

প্রাকৃত সৃষ্টি।

এক কাল ছিল, যখন কিছুই ছিলনা; যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য তাহার কিছুই ছিলনা; কেবল ছিলেন এক জন, যিনি অনুভবগোচর বা অনুমানগম্য নহেন; অন্ততঃ মানবজাতির অধিকাংশের পক্ষে নহেন; তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক; অমনি সব হইল; যাহা কিছু দেখা যায়, বা দেখা যাইবে, বা দেখা যাইবার সম্ভব, সকলই অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল। এইরূপ একটা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনা বা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে। সুস্থ মনুষ্যের আলোচ্য বটে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রমে আকাশ, আকাশাৎ বায়ু, এইরূপ, অথবা এই জাতীয় অপরবিধ সৃষ্টিপ্রণালীর বর্ণনা আছে, যাহা উন্নত মনুষ্যত্বের পরিণত চিন্তার ফল, যাহাকে দার্শনিক সৃষ্টি অভিধান দেওয়া যাইতে পারে; এ প্রস্তাবে তাহাও আলোচিত হইবেনা।

প্রাকৃত সৃষ্টি এই প্রবন্ধের আলোচ্য। সৃষ্টিশব্দের অপপ্রয়োগ হইতেছে কি না, ঠিক বলা যায়না। যে ঘটনা কবে আরম্ভ হইয়াছে জানিনা, কবে শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই; যাহা চলিতেছে, মনুষ্যদৃষ্টি অতীত অতিক্রম করিয়া যত দূরে পৌঁছিতে পারে বা পৌঁছিতে সাহস করে, এবং সুদূর অতীতের তামসী কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তর দিয়া না দেখিয়াও দেখে বা দেখিয়াও দেখেনা, সেই অবধি আজি পর্য্যন্ত যে ঘটনা বোধ করি সমানভাবে চলিতেছে;

সেই ঘটনাকে সৃষ্টি বলিলে যদি বিশেষ ভাষাগত অপরাধ না হয়, তবে সৃষ্টি বলিতে পারা যায়। আমি এইক্ষণে আমার সম্মুখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ একটা মহাব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত, কি কারণে জানিনা, ইহার পরিসর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার পরিধি ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। ইহার পরিসরের সীমা কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিনা; ইহার জটিলতারও অন্ত কোথায়, তাহাও নিরূপিত হয়না। তথাপি এই দুর্ভেদ্য জটিলতার গ্রন্থি কতক উন্মোচন করিয়া শৃঙ্খলের পরম্পরাসূত্র কতক আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা চলেনা। তাই যেরূপে হউক, একটা শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিতে মন স্বতই ধায়। এই শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিমিত্ত, এই গ্রন্থির উন্মোচনের নিমিত্ত, মনুষ্যজাতির অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির নাম বৈজ্ঞানিক রীতি। মনুষ্যমাত্রই কতক না কতক পরিমাণে এই বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। তাই জীবনযাত্রা চলিতেছে। মোটের উপর জীবনযাত্রার সফলতা ধরিয়া অবলম্বিত রীতির বৈজ্ঞানিকতা পরিমিত হইতে পারে।

যাহাই হউক মানুষের মন এই শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে চায়; এবং শৃঙ্খলার পরম্পরা ও সূত্র ধরিয়া অতীত কালের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে গিয়া পরাহত হইতে বাধ্য হয়। সেইখানে জগতের আদি কল্পনা করে ও তৎপর হইতে সৃষ্টি ব্যাখ্যান করিতে চায়। সেই আদিতে কেমন ছিল, তার পর কেমন হইল, তার পর কেমন হইল, এইরূপে চলিয়া এখন যেরূপ আছে, তাহাতে পৌছিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছিল, এখনও হইতেছে, ও পরেও হইবে। এই চেষ্টার বৈজ্ঞানিকতারও ক্রম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে চেষ্টা হইয়াছিল,

তাহা এখনকার দৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতির সহিত সঙ্গত হয় না। আবার এখন যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আর কিছু দিন পরে হয়ত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার অনুমোদিত হইবেনা। তা নাই হউক, মনুষ্যের এই চেষ্টা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক; এবং ইহার আলোচনাতেও লাভ আছে।

ফলে বহুদিন হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রাকৃত সৃষ্টির বহুবিধ বিবরণ মানুষের বিজ্ঞানেতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই আদিতে কি ছিল? সেই আদি, অর্থাৎ যে আদির পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি চলেনা, যেখানে পৌঁছিয়া আমাদের যুক্তিপ্রণালী পরাহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেহ বলিয়াছেন, তখন ছিল জল আর জল। কেহ বলিয়াছেন, আকাশ আর আকাশ। কেহ বলিয়াছেন, আগুন আর আগুন। জল হইতে বা আগুন হইতে বা আকাশ হইতে, এইরূপে, অধুনা প্রতীয়মান এই জগৎ বিকশিত হইয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিকেরা কি বলেন, একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। আদিতে কি ছিল? যত দূর অনুমান হয়, জলও নহে, আগুনও নহে, বোধ হয় বায়ু আর বায়ু; হইতে পারে তৎপূর্ব্বে ছিল আকাশ আর আকাশ। আজ কাল আধুনিকেরা বায়ু লইয়াই আরম্ভ করেন।

আধুনিকদের প্রথম ইমানুয়েল ক্যাণ্ট। লুক্রিশিয়স বা দিমক্রিতসের কথা আনিবার দরকার নাই; কেন না, এক হিসাবে তাঁহারা আধুনিক বলিয়া গণ্য হয়েননা। ইমানুয়েল ক্যাণ্ট এই হিসাবে আধুনিক। ক্যাণ্ট নিউটনের পরবর্ত্তী; এবং নিউটন জগৎশৃঙ্খলের জটিলতম গ্রন্থির প্রথম উন্মোচক।

ক্যাণ্ট বলিলেন, আদিতে সূর্য্য ছিলনা, গ্রহ উপগ্রহ ছিলনা।

সমগ্র জড় বিস্তৃতদেশ ব্যাপিয়া বায়ুর আকারে অবস্থিত ছিল। বায়ুর আকারে ছিল, তবে সে বায়ু আমাদের বায়ুর মতও নহে; ইহার অপেক্ষাও সহস্রগুণে লঘু। আবার সে বায়ুতে সোণা ছিল, লোহা ছিল, রূপা ছিল, ইত্যাদি। জড় পরমাণুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ ছিল, তাই বায়ু ক্রমে ক্রমে স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া ছোট বড় পিণ্ডে পরিণত হইয়া সূর্য্যগ্রহ উপগ্রহাদিতে পরিণত হইয়াছে।

ক্যাণ্টের পর উইলিয়ম হর্শেল। হর্শেল বহুসংখ্যক নীহারিকার আবিষ্কর্ত্তা। ছায়াপথ সহজ চোখে কুয়াসার মত দেখাইতে পারে; কিন্তু যন্ত্রযোগে উহা অতিদূরস্থ সংখ্যাতীত নক্ষত্রের সমষ্টি বলিয়াই ধরা পড়ে। কিন্তু নীহারিকা নীহারিকামাত্র; ধুঁয়া অথবা কুয়াসার মত, উৎকৃষ্ট যন্ত্রের কাছেও তাহার কুজ্ঝটিকাত্ব লোপ পায়না; নীহারিকা নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া বোধ হয়না। হর্শেল বলিলেন, ঐ জগৎনির্ম্মাণের মশলা এখনও কিছু কিছু স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ কুজ্ঝটিকার মত যে বায়বীয় পদার্থ ঈষদ্দীপ্ত অবস্থায় দেখা যায়, উহাই এককালে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিল। কালে জমাট বাঁধিয়া সূর্য্যগ্রহ-উপগ্রহাদির নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোন স্থানে ভাল জমাট বাঁধিয়াছে, কোন খানে বা বাঁধিতেছে, কোন খানে বা অদ্যাপি বাঁধে নাই; বিস্তীর্ণ নভঃপ্রদেশ অনুসন্ধান করিলে সকল অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় সমকালে লাপ্লাস। লাপ্লাস বলিলেন, আদিকালে সেই বায়ুরাশি বিশাল আবর্ত্তের মত একটা কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিত। মাধ্যাকর্ষণে সেই আবর্ত্ত ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল; তাহার পরিধির পরিসর ক্রমে কমিতে লাগিল। আবর্ত্তের পরিসর কমিলে আবর্ত্তের বেগ ক্রমে বাড়ে, এই একটা নিয়ম আছে। আবর্ত্তনশীল বায়ুময় পিণ্ডের মেরুপ্রদেশ ক্রমে চাপিয়া যায়, ও মধ্যদেশ অর্থাৎ নিরক্ষ-

দেশ ক্রমে স্ফীত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গুরীর আকারে ছাড়িয়া আসে। সেই অঙ্গুরীয় আবার কালক্রমে ছিন্ন ভিন্ন ঘনীভূত ও পিণ্ডীভূত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি করিয়া মধ্যবর্ত্তী আবর্ত্তনশীল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মধ্যস্থ সূর্য্য ক্রমে ঘনীভূত ও স্বল্পায়তন হইতে থাকে, আর তাহা হইতে একটা একটা অঙ্গুরী ছাড়িয়া এক একটা গ্রহের সৃষ্টি করে। সূর্য্য বা নক্ষত্র হইতে যে পদ্ধতিতে গ্রহের উৎপত্তি হয়, গ্রহ হইতে সেই পদ্ধতিতে ক্রমে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

এই সেই লাপ্লাসের উদ্ভাবিত বিখ্যাত নীহারিকাবাদ ; ইংরাজিতে নেবুলার থিওরি। এই সৃষ্টিব্যাখ্যার ভিতরে যতটুকু কবিত্বরস আছে, কেহ কেহ বলেন, সে পরিমাণে যুক্তিরস নাই। তথাপি এই সৃষ্টি ব্যাখ্যার একটা অপূর্ব্ব মোহকর আকর্ষণ আছে ; যেখানে সম্পূর্ণ আঁধার ছিল, সেখানে ইহার সাহায্যে আলো পাওয়া যায়। সৌরজগতের অন্তবর্ত্তী গ্রহমাত্রই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরে কেন? সকলেরই ভ্রমণপথ প্রায় এক সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত কেন ? প্রায় সকলেই একই মুখে নিজ নিজ ধ্রুব রেখার উপরে আবর্ত্তন করে কেন? গ্রহগণের মধ্যে যেগুলি বড়, মোটের উপর তাহাদের উপগ্রহের সংখ্যা অধিক, মোটের উপর তাহারা এখনও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত রহিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা আছে, যাহা পূর্ব্বে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইত। লাপ্লাসের সৃষ্টিব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সেই সকল প্রহেলিকার সমস্যা কতকটা মীমাংসিত হয়। আবার শনৈশ্চরের অঙ্গুরী, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের অবস্থান, এ সকলেরও কতকটা সঙ্গত তাৎপর্য্য পাওয়া যায়।

তথাপি যখন বড় হর্শেলের পুত্র ছোট হর্শেল, প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্রপ্রয়োগে পিতার আবিষ্কৃত অনেকগুলি নীহারিকাকে নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র

প্রতিপন্ন করিলেন, তখন সেই মোহকর সৃষ্টিবিবরণের প্রতি পণ্ডিত গণের আস্থা কমিয়া গেল। স্বনামখ্যাত দার্শনিক কোমত গণিত প্রয়োগে নীহারিকা হইতে সৌরজগতের সমুদয় খুঁটিনাটি উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গণিতবিৎগণের তীব্র ব্যঙ্গ ও উপহাসের ভাগী হইলেন। সাব্যস্ত হইল, নীহারিকা বাষ্পবীয় পদার্থ নহে, দূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র। কুজ্ঝটিকার মত দেখায়, কেবল দূরে অবস্থানপ্রযুক্ত। উহারা জগৎ নির্ম্মাণের মশলা নহে, সুপরিণত সুগঠিত পূর্ণাবয়ব বহু-সংখ্য জগতের সমবায়মাত্র।

এইরূপ অবস্থা, এমন সময়ে কির্কফের আবিষ্কৃত আলোকবিশ্লেষণ প্রণালী বৈজ্ঞানিকের হস্তে নূতন, অচিন্তিতপূর্ব্ব, প্রচণ্ড শক্তি আনিয়া দিল। জ্ঞানের ইতিহাসে সেই এক দিন।

বস্তুতই সেই এক দিন। নিউটন শুভ্র সূর্য্যালোকের ভিতর হইতে রক্ত নীল পীত নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়াছিলেন।* কির্কফের আদেশে সেই রক্ত নীল পীত বিবিধ বর্ণের রশ্মিগুলি বিচিত্র কথা কহিতে লাগিল। কে কোথা থাকে, কে কোথা হইতে আসে, কির্কফের আদেশে দ্বিধাহীনচিত্তে, অকপটভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া ফেলিতে লাগিল। কির্কফের প্রচণ্ড উইল ফোর্স ছিল, সন্দেহ নাই।

ফলে সেইদিন হইতে রক্তনীলপীত রশ্মিগুলি আপন আপন কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, আমি থাকি নুনে; কেহ বলিল, আমি থাকি চুনে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

* নিউটনের পূর্ব্বেও শুভ্র সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট হইয়া রক্তপীতাদি বর্ণের বিকাশ করিত। তবে নিউটন এই বিশ্লেষণ ঘটনায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। নিউটন একবার দৃষ্টিপাত করিলেই প্রকৃতি দেবী তাঁহার নিগূঢ় রহস্যগুলি আপনা হইতে বলিয়া ফেলিতেন। এই এক রকম হিপনটিজম বা বশীকরণ বিদ্যা।

যে যেথান হইতে আসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আরও কত খবর দিল। ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে দূরে যাইতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই বেগে কাছে আসিতেছে, ঐ নক্ষত্রটা এই কারণে জ্বলিয়া উঠিল, ঐখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটিল, ঐখানে দুইটায় ধাক্কা লাগিল, সূর্য্যমণ্ডলের ঐখানে ঝড় বহিতেছে; ইত্যাদি কত কথাই বলিতে লাগিল।

প্রকাশ পাইল সূর্য্য কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে, তবে উহার মণ্ডলকে আবরণ করিয়া এখনও বায়ু রহিয়াছে। আর সে বায়ুতে তামা লোহা দস্তা প্রভৃতি বর্ত্তমান। যে সকল বস্তু সূর্য্যে আছে, তাহার সবই পৃথিবীতে রহিয়াছে; হইতে পারে, এত বড় প্রকাণ্ড সূর্য্যে এমন দুই চারিটা পদার্থ আছে, যাহা পৃথিবীতে মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে পার্থিব উপকরণই বর্ত্তমান; পার্থিব মশলাতেই সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মিত। সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড তপ্ত ভয়াবহ পৃথিবী। নক্ষত্রগুলাও তাই। সেই সব উপকরণেই নির্ম্মিত। কোনটায় কোন পদার্থ বেশী আছে, কোনটায় হয়ত কম আছে, এই মাত্র; কোনটা একটু বেশী গরম, কোনটা একটু কম গরম, এই পর্য্যন্ত। আর নীহারিকা কি? নীহারিকা বস্তুতঃ নীহারিকামাত্র; তাহাতেও পার্থিব উপকরণই বিদ্যমান; কিন্তু এখনও জমে নাই; এখনও লোহা দস্তা কয়লা যাহা কিছু যেথানে আছে, সবই বায়ুর আকারে। কালে জমিয়া যাইবে। কোনটা জমিতেছে, কোনটা নক্ষত্রে প্রায় পরিণত হইয়াছে, কোনটা বা হইবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যাদি।

আজ হেলমহোলৎজ নাই; কিন্তু তখন হেলমহোলৎজ উগ্র প্রতিভার-তীব্র আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তিমিররাজ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। হেলমহোলৎজ দেখাইলেন, সূর্য্যের এই তেজ আইসে কোথা হইতে। বৎসর বৎসর-রাশি রাশি তেজের অপচয় হইতেছে, অথচ

ভাণ্ডারের যেন ক্ষয় নাই। সামান্য একটা আগুন বজায় রাখিতে কাঠ বা কয়লা চায়, তেল চায়; একটা স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনের জন্য বেগে চকমকি ঠুকিতে হয়। সূর্য্যের এই তাপভাণ্ডারের সঞ্চয় হইতেছে কোথা হইতে? কাঠ, কয়লা, গন্ধক, উদজান? সমস্ত সূর্য্যমণ্ডলটা দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও এত কাল ধরিয়া এত অপব্যয় সহিত না। সংঘাত? সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের সংঘাতেও এত তাপ জন্মে না। হেলমহোলৎজ এসব বিষয়ে গণনায় বড়ই নিপুণ ছিলেন।* একমণ ওজনের একটা উল্কাপিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশ হইয়া উপনীত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলকে অকস্মাৎ একটা ধাক্কা দিলে দিবাকরের ক্রোধাগ্নি এক ডিগ্রির কত ভগ্নাংশ উদ্দীপিত হইবে, এবং তাহার এই আকস্মিক চাঞ্চল্যটুকু অপনীত হইতেই বা এক সেকেণ্ডের লক্ষভাগের কত ভগ্নাংশ সময় অতীত হইবে, এই সকল হিসাব অকাতরে ও অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত স্থির করা, হেলেমহোলৎজের অভ্যাস ছিল। তবে সূর্য্যের তাপ জন্মে কিসে? এক মাত্র উপায় আছে। সূর্য্যদেব আপনার বিপুল কলেবর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিতেছেন; সঙ্কুচিত করিতেছেন ও গরম হইতেছেন। তবে দেবতার কোপ অনেক সময়ে শুভফল আনয়ন করে। তিনি গরম হইতেছেন; আর তাহার ফলে সুদূরে আমাদের এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে জল পড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিতেছে, 'সুবোধ গোপাল যা পাইতেছে তাই খাইতেছে, যা পাইতেছে তাই পরিতেছে,' আর দুষ্ট রাখাল তাহার ছোট ছোট ভাই ভগিনীর সহিত অবিরত হাঙ্গামায় ব্যাপৃত রহিয়াছে।

---

* বলা বাহুল্য, তৎশিষ্যবর্গের প্রসাদে আজকাল অর্ব্বাচীন নাবালকেও এইরূপ হিসাবগুলা এক নিশ্বাসে সম্পন্ন করিয়া ফেলে।

ফলে সূর্য্য ক্রমেই কলেবর সঙ্কোচ করিতেছেন; ক্রমেই জমিতেছেন; অদ্যাপি মোটের উপর পৃথিবীর তুলনায় একটু হাল্‌কা আছেন। কিন্তু সঙ্কোচনের একটা সীমা আছে। কুবেরের ভাণ্ডারেরও বোধ করি ক্ষয় আছে; সূর্য্যদেবের তাপের ভাণ্ডারও কালক্রমে নিঃশেষিত হইবে। কত দিনে হইবে, তাহারও মোটামুটি হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। তবে সে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লেখকের বা পাঠকের কোনও চিন্তার কারণ বর্ত্তমান নাই। তৎপূর্ব্বে বহুল পাঠকবংশ বিলুপ্ত হইবে, এবং বহুলতর লেখকের কঙ্কাল চিত্রশালায় স্থান লাভ করিবে।

সৃষ্টি ঘটনা লইয়া কথা। এমন কাল ছিল, সূর্য্যের কলেবর আরও বিস্তৃততর প্রদেশ ব্যাপিয়া ছিল। সূর্য্যে এখন যে সোণা রূপা লোহা বর্ত্তমান আছে, বা ভবিষ্যতে যে মাণিক মুক্তার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা এক কালে বায়ুর আকারে যথা তথা বিন্যস্ত হইয়া বোধ করি বিশাল বাতাবর্ত্তে বিশাল জগৎ ব্যাপিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। লাপ্লাসেরও ত এই অনুমান।

সূর্য্যসম্বন্ধে যাহা, অন্যান্য নক্ষত্রসম্বন্ধেও তাহাই। তাহারাও ত ছোট বড় সূর্য্য। সুতরাং এখন ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যতদূর দেখা যাইতেছে, সেই পরিধির অভ্যন্তরে সমগ্র প্রদেশটাই আদিকালে নীহারিকাব্যাপ্ত বা বায়ুব্যাপ্ত ছিল।

নীহারিকা হইতে জগতের উৎপত্তি ঘটনা স্থূলতঃ এইরূপ। ইহার উপর আর দুই চারিটা কথা আছে। সম্প্রতি এই কথাগুলা নূতন উঠিয়াছে।

প্রতি রাত্রেই আমরা সহজ চোখে দুই চারিটা, যন্ত্রযোগে দুশ পাঁচশটা নক্ষত্রপাত দেখিতে পাই। বস্তুতঃ উহা নক্ষত্রপাত নহে। নক্ষত্রপাত পৃথিবীর পক্ষে বড় বিভ্রাট ব্যাপার; পৃথিবীর অদৃষ্টে তাহার

সম্ভাবনাও বিরল। বরং নক্ষত্রবিশেষে পৃথিবীপাত ঘটিতে পারে, পৃথিবীতে নক্ষত্রপাত ঘটিবার কল্পনা করিতে পারি না। যাহা পৃথিবীতে পড়ে, তাহা নক্ষত্র নহে; তাহা উল্কাপিণ্ড, ক্ষুদ্র পদার্থ, দুইদশ রতি হইতে দুদশমণ পর্য্যন্ত। সৃষ্টিছাড়া পদার্থে নির্ম্মিত নহে; মোটামুটি লোহা আর মাটি। কখনও কাহারও মাথায় পড়িয়াছে কিনা, ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায়না; তবে লোকের নিকটে পড়িয়াছে ও সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদেরই কলিকাতার মিউজিয়মে অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড পতনের ও সংগ্রহের দিন ও তারিখ সমেত সংগৃহীত আছে। উহাদের বেশীর ভাগই এত ছোট যে, ভূবায়ুতে বেগে প্রবেশ করিয়া বায়ুর আঘাতে ও ঘর্ষণে তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া যায়। ভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছে না; অথবা চূর্ণ হইয়া বায়ুতে বহুকাল ধরিয়া ভাসিতে থাকে। কালে অধঃপতিত ও সাগরতলস্থ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সম্প্রতি মহাসাগরের গর্ভ হইতেও এইরূপ উল্কাচূর্ণ সংগৃহীত হইয়াছে।

ফলতঃ সমগ্র নভঃপ্রদেশে এই ছোট বড় উল্কাপিণ্ড ছড়ান আছে। পৃথিবী চলিতে চলিতে তাহার কতকগুলি ক্রমে আত্মসাৎ করিতেছে। শূন্য দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ উল্কাপিণ্ডের পাল কোটি কোটি একত্রে দল বাঁধিয়া পঙ্গপালের মত বিস্তৃত দেশ ছাইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর সহিত কখন কখন এইরূপ এক একটা উল্কাদলের দেখাসাক্ষাৎ ঘটে; তখন আর কেবল উল্কাপাত ঘটেনা; তখন উল্কাবৃষ্টি ঘটে। যেমন জলবৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি, অথবা কবিগণের বর্ণিত পুষ্পবৃষ্টি, সেইরূপ উল্কাবৃষ্টি; দেখিতে অগ্নিবৃষ্টির মত। বাঙ্গালায় ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের উল্কাবৃষ্টি অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। এইরূপ উল্কাবৃষ্টি—লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ডের পৃথিবীতে পতন—জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভূবায়ুতে প্রবেশ।

ইহার মধ্যে আর একটি রহস্যের কথা আছে। মাঝে মাঝে ভীম পুচ্ছ উড়াইয়া ধূমকেতু আসিয়া দেখা দেয়। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথ উল্কাপালের ভ্রমণপথের সহিত অভিন্ন। এমন কি ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পৃথিবী একটি পরিচিত ধূমকেতুর রাস্তা পার হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু ধূমকেতুর সহিত সাক্ষাৎ না হইয়া একদল উল্কার সহিত সাক্ষাৎ হয়। লকিয়ার সাহেব দেখাইয়াছেন, ধূমকেতু যে আলো দেয়, মিউজিয়মের সংগৃহীত উল্কাপিণ্ড জ্বালাইয়া ঠিক সেই আলো বাহির করিতে পারা যায়; এবং কির্কফের পর হইতে আলো কখন মিছা কথা কহেনা। সুতরাং, সম্ভবতঃ ধূমকেতু উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র।

ইংরাজ অধ্যাপক টেট সাহেব কথাটা প্রথমে উত্থাপন করেন এবং ফরাসীস্ পণ্ডিত কে সাহেব উহা পাকাপাকি করিয়া তুলেন। তিনি বলিলেন, আদিকালে গ্রহনক্ষত্র সমস্ত বায়ুর আকারে জগৎ ব্যাপিয়া ছিল, এমন কি কথা আছে?

তখন জগৎ এই সকল উল্কাপিণ্ডে আকীর্ণ ছিল। বায়ুকণা ও উল্কা উভয়ে তফাত কি? বায়ুকণা কিছু ছোট, উল্কাপিণ্ড কিছু বড়। এখন যেমন স্থানে স্থানে উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া আছে,আর তদ্ভিন্ন সমগ্র আকাশে সমুদ্রে জলচরের মত, বায়ুতে ধূলিকণার মত, ছড়াইয়া আছে; তখনও উল্কাপিণ্ড সেইরূপ শূন্য প্রদেশ ছড়াইয়াছিল। কালে তাহারা একত্র হইয়া জমাট বাঁধিয়া সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি বড় বড় পিণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে।

জর্জ ডারুইন দেখাইয়াছেন,সংখ্যাতীত বায়বীয় পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকল একত্রে ছুটাছুটি করিলে যে সকল ব্যাপার দেখা যায়, সংখ্যাতীত উল্কাপিণ্ড একত্রে ছুটাছুটি করিলেও ঠিক্ সেইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। গণনায় উভয় হইতেই এক রকমই ফল পাওয়া যায়। সুতরাং নীহারিকা

বা বায়বীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তি যেমন বুঝান চলে, কোটি কোটি ইতস্ততঃ ভ্রমমাণ উল্কার সমবায় হইতেও উহা সেইরূপ বুঝান যাইতে পারে।

লকিয়ারের হাতে উভয় মতের কতকটা সমন্বয় হইয়াছে। উল্কাপিণ্ড আকাশে ছড়াইয়া আছে; স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া চলিতেছে; গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহারাও অনেকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে; ধূমকেতু এইরূপ উল্কাপিণ্ডের দল, পরস্পর সংঘাতে ধূম বাষ্প বায়ু উদ্গিরণ করে। সৌরজগতের ভিতর কতকগুলি ধূমকেতু রহিয়াছে: তাহারা সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগণের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে সৌরজগতের বাহির হইতে, হয়ত অন্য নক্ষত্রজগৎ হইতে আসিয়া দেখা দেয়, এবং আমাদের সূর্য্যকে একবার ঘুরিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া যায়। কেহ কেহ বাহির হইতে আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে; কিন্তু তাহার পর আর বাহিরে যায়না; ইহারই অন্তভু্ক্ত হইয়া যায়। লেবেরিয়ের অনুমান মত ইংরাজি ১২৬ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ্চমাসে এইরূপ একটা উল্কাপাল বাহির হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিয়াছিল; তখন উরেনস বা বরুণগ্রহ তাহার পথের নিকটে ছিল। বরুণগ্রহের আকর্ষণে তাহার পথ ঘুরিয়া যায়। তদবধি আমাদের সহিত তাহার স্থায়ী আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। সেই অবধি প্রতি তেত্রিশ বৎসরে সেই উল্কাপাল একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে; তেত্রিশ বৎসর অন্তর নবেম্বরের মাঝামাঝি পৃথিবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে; তখন পৃথিবীতে উল্কাবর্ষণ ঘটিয়া থাকে। ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালের নবেম্বরের মাঝামাঝি আমাদের সহিত তাহার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ ঘটিবে, এবং ঐ সময়ে রাত্রিকালে পুনরায় উল্কাবৃষ্টি দেখা যাইবে। পৃথিবী এইরূপে উল্কাখণ্ড ক্রমেই আত্মসাৎ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে। উল্কাপুঞ্জের

পরস্পর সংঘর্ষ ও সমবায় হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই সংঘর্ষ অদ্যাপি চলিতেছে। পৃথিবীর নির্ম্মাণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহেও এইরূপ চলি-তেছে। সূর্য্যমণ্ডল ও বুধগ্রহের মধ্যে শূন্য ব্যাপিয়া এইরূপ অসংখ্য উল্কাপিণ্ডের অবস্থিতি রহিয়াছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যাহা সামান্যভাবে ঘটিতেছে, সূর্য্যে তাহা প্রচণ্ডভাবে ঘটিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপের কিয়দংশ এই সংঘর্ষ হইতে উদ্ভূত সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে এক একটা নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠে, দেখা যায়। এই সে দিনই ১২৯৮ সালের মাঘমাসে উত্তর নভঃপ্রদেশে বৃষরাশির উত্তরে অরিগানাক নক্ষত্রপুঞ্জের অভিমুখে একটা নক্ষত্র হঠাৎ কিছুদিনের জন্য জ্বলিয়া আবার নিবিয়া গিয়াছে। ইহাও হয়ত দুইটি উল্কাপালের পরস্পর সংঘর্ষে। ঠিক কারণনির্দ্দেশ দুরূহ। তবে চারিদিক দেখিয়া বিবে-চনা ও অনুমান করিতে হয়। যাহাদিগকে নীহারিকা বলা যায় তাহাতে বায়বীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে সত্য; তাহাদের আলোকেই সে কথা বলিয়া দেয়। কিন্তু তাহারাও বিস্তৃত দেশব্যাপী উল্কাসমষ্টি, কতকটা বড় বড় ধূমকেতুর মত। পিণ্ডগুলা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ছুটিতেছে, চূর্ণীভূত ও বাষ্পীভূত হইতেছে। কালে জমাট বাঁধিতেছে। জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ নির্ম্মাণ করিতেছে। সমুদয় জ্যোতিষ্কের আকার অবয়ব বর্ণ পর্য্যা-লোচনা করিয়া তাহাদের বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। উল্কাপিণ্ড সকলেরই মশলা। সেই উপাদান হইতে সকলেই নির্ম্মিত হইয়াছে। কেহ এখনও ভ্রূণ, কেহ শিশু, কেহ বা যুবা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বৃদ্ধ। কেহ এখনও দীপ্তিলাভ করে নাই, কেহ দীপ্তিবিকাশ আরম্ভ করিয়াছে। কেহ পূর্ণ গৌরবে ভাস্বর, কেহ নির্ব্বাণোন্মুখ,

কেহ নির্ব্বাপিত। বয়স হিসাবে লকিয়ারের প্রণীত জ্যোতিষ্কগণের শ্রেণী-বিভাগ কতকটা এইরূপ।

১। সংখ্যাতীত উল্কাপিণ্ডের দল, কোটি কোটি কোটি ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। মশলার স্তূপ। জগতের ভ্রূণ। কঠিন শীতল দীপ্তিহীন পিণ্ডের পরস্পরের সংঘর্ষে দীপ্তিময় বায়ু বাষ্প প্রভৃতির উদ্গম। নাম নীহারিকা। নীহারিকার ক্ষুদ্র টুকরার নাম ধূমকেতু। আকারের স্থিরতা নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বের নির্দ্দেশ নাই; দূর হইতে কুয়াসার মত, অবয়বহীন মেঘখণ্ডের মত দেখায়। অনেকে চোখে এমন কি দূরবীণেও নক্ষত্রেরই মত দেখায়; কিন্তু ফটোগ্রাফে নীহারিকারূপে ধরা পড়ে। কৃত্তিকান্তর্গত নক্ষত্রগুলি উদাহরণ।

২। কতকটা জমাট বাঁধিয়াছে; সংঘর্ষ, ঠোকাঠুকি চলিতেছে; ফলে উষ্ণতা বাড়িতেছে। শিশু জগৎ। আকারে নক্ষত্রের মত; আরক্তবর্ণ। কালপুরুষের অন্তর্গত আর্দ্রানক্ষত্র উদাহরণ।

৩। জমিয়া ঘনীভূত হইয়া তপ্ত উষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় তরল বিশাল পিণ্ডে পরিণত; অভ্যন্তরে তরল পিণ্ড, উপরে শীতলতর বাষ্পের আবরণ; সঙ্কোচনশীল, কিন্তু সঙ্কোচনে উষ্ণতা বর্দ্ধমান। সঙ্কোচনে ও ঘনীভবনে তাপ জন্মিতেছে ও বাড়িতেছে, ও সেই তাপ বিকিরণ করিতেছে, বিলাইতেছে। আয় অধিক, ব্যয় কম; মোটের উপর ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতেছে। দেখিতে কতকটা আমাদের সূর্য্যের মত। জগতের কিশোর বয়স; নূতন স্ফূর্ত্তি, চাঞ্চল্য, তারল্য। উত্তরাকাশে অভিজিতের কিছু পূর্ব্বে ছায়াপথমধ্যে যে উজ্জ্বল তারকা দেখা যায় (আরিদেদ), কালপুরুষের দক্ষিণপশ্চিম কোণস্থিত রিগেল এবং বৃষরাশিস্থ রোহিণীনক্ষত্র এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৪। উষ্ণতার চরম পরিণতি; অভ্যন্তরের জ্বলন্ত তপ্ত পিণ্ডের

আলোক শীতলতর আবরণ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ফুটিয়া আসিতেছে। দীপ্তির পরাকাষ্ঠা, মাহাত্ম্যে অতুল। জগতের পূর্ণ যৌবন। লুব্ধক, অভিজিৎ, উত্তরভাদ্রপদ (আলফেরাত) প্রভৃতি উজ্জ্বল তারকা উদাহরণ।

৫। যৌবন প্রৌঢ়ত্বে পরিণত। সঙ্কোচন চলিতেছে, কিন্তু আয় অল্প, ব্যয়ে আর কুলায় না। উষ্ণতার ক্রমিক হ্রাস। দেখিতে প্রায় তৃতীয় শ্রেণীর মত; তবে সেখানে গৌরব বর্দ্ধমান, এখানে গৌরব হ্রাসের মুখে। আমাদের সূর্য্য সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বাতী, ব্রহ্মহৃদয়, প্রশ্বান, প্রভৃতি উদাহরণ।

৬। নির্ব্বাণোন্মুখ, ঘনীভূত, কঠিন, শীতল, দীপ্তি দেয় কি দেয়না। বার্দ্ধক্য উপস্থিত, নির্ব্বাণোন্মুখ; সুতরাং দূরবীক্ষণে দেখা যায় বা যায়না।

৭। নির্ব্বাপিত, মৃত, শীতল, দীপ্তিহীন, আঁধার, বিশাল, কঠিন জীবনহীন জড়পিণ্ডে পরিণত। দূরবীক্ষণে দেখা যায়না। গণিতের সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

চন্দ্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড, যাহারা এককালে সম্ভবতঃ বৃহত্তর সূর্য্যের অঙ্গীভূত ছিল, তাহারা ক্ষুদ্রত্বের নিমিত্ত বহুকাল হইল এই শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

প্রকৃতির মূর্ত্তি।

সাংখ্যদর্শনে যে অর্থে প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার হয়, এখানে প্রকৃতি বলিতে তাহাই বুঝিব। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অর্থ লইয়া যথেষ্ট বাগ্‌-বিতণ্ডা তুলিয়া একটি সুবৃহৎ ও সুপুষ্ট প্রবন্ধ লেখা চলিতে পারে। সেরূপ বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া, ব্যক্ত প্রকৃতি অর্থে মোটের উপর সকলে যাহা বুঝেন, তাহাই ধরিয়া লইব।

-একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ লইয়া। ব্যক্ত প্রকৃতির মূলে অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনও কথা এখানে তুলিবনা। সাংখ্যদর্শন এই অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্বে বড় সন্দিহান নহেন। বেদান্তের সহিত এইখানে সাংখ্যের বোধ করি মূলগত প্রভেদ। আজি কালি অজ্ঞেয় বলিয়া কথাটা চাপা দিয়া রাখাই পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে।

ব্যক্ত প্রকৃতি—অর্থাৎ জগৎ আমার নিকট যে ভাবে প্রতীয়মান হয়। জগতের একটা রূপ আছে,—আমাকে ছাড়িয়া আছে বলিতেছিনা; আমার কাছে একটা রূপ আছে—ইহা স্বীকার্য্য। এই রূপটা গন্ধস্পর্শশব্দাদিময়। যে কাগজখানার উপর কালির আঁচড় দিয়া লিখিয়া যাইতেছি, গন্ধস্পর্শাদি পাঁচটা বিষয় তাহা হইতে বাহির করিয়া লইলে, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা—কথাটা বোধ করি সম্পূর্ণ ঠিক্ হইলনা। কেন না, রূপরসাদি আমার বর্ত্তমান, এই মুহূর্ত্তের প্রত্যক্ষ জগতের সম্পত্তি। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগৎ ছাড়াইয়া জগতের আরও খানিকটা অংশ আছে, সেটাও প্রকৃতির অংশ। সেটা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ নহে, এই মুহূর্ত্তে তাহাকে

আমি ছুইয়া নাই ; কিন্তু বস্তুতঃ এককালে হয়ত আমার সহিত তাহার স্পর্শ ঘটিয়াছিল ; কখন তাহা আমার প্রত্যক্ষ বিষয় ছিল ; অথবা ভবিষ্যতে আমার প্রত্যক্ষ বিষয়ের মাঝে আসিতে পারে। হয়ত আমার প্রত্যক্ষবিষয় কখন হয় নাই বা হইবেনা ; কিন্তু তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়া তাহার সত্তা স্বীকার করিয়া লই। সম্প্রতি অজ্ঞাতপূর্ব্ব নেপচুন গ্রহের স্থানসম্বন্ধে লেবেরিয়ের গণনার সহিত আডামসের গণনার তুলনা করিতেছিলাম। নেপচুন গ্রহ কখন আমার প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে নাই ; তাহার রূপরসগন্ধ কখন আমার ভোগে আইসে নাই। ইহার মধ্যে যে কখন আসিবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিনা। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া তাহাকে আমার জগতের বাহির বলিতে পারিনা। জানালা দিয়া ঐ যে সান্ধ্যগগনের পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল পূর্ব্বাকাশে এখনি দেখিতেছি, এই চন্দ্রও আমার পক্ষে যে ভাবে যে অর্থে অস্তি, আমার পুঁথিগতনামা নেপচুন গ্রহও আমার নিকট সেই অর্থে অস্তি। চন্দ্র ও নেপচুন উভয়েরই দূরত্ব ব্যবধান আকারপ্রকার সম্বন্ধে কতকগুলা পরস্পর তুলনীয় ভাব, একই সঙ্গে আমার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করিতেছে। গল সাহেবের দূরবীন প্রয়োগের আগে উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয়ের মানস চক্ষের সমক্ষে নেপচুন গ্রহ যেমন আবির্ভূত ছিল, সম্প্রতি আমারও মনশ্চক্ষু কতকটা সেইরূপ সেইদিকে ধাবিত হইতেছে।

ফলকথা, জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যেটুকু, তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের অর্থাৎ কতিপয় অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। আর প্রত্যক্ষের বাহিরে যে টুকু, সে টুকু বর্ত্তমানের অনুভূতি নহে ; সেটাকে স্মৃতি বা অনুমান, কল্পনা বা যুক্তি, বিশ্বাস বা স্বপ্ন, এই সকলের মধ্যে ফেলিতে পারা যায়। স্মৃতি, অনুমান, যুক্তি, যাহাই বল, কাহারও না কাহারও

কোন না কোন কালের অনুভূতি হইতে তাহার উৎপত্তি সে বিষয়ে দ্বিধা করিও না। সেরূপ দ্বিধা করিতে গেলে একালে আর চলিবেনা। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, সমগ্র ব্যক্ত প্রকৃতির মানচিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে; সেইটা আমাদের বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোয় আধ আঁধারে, আরও খানিকটা স্থান ঈষৎ অপরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সামগ্রী নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত; খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটার নাম দূরগত ও দর্শনাতীত; আর খানিকটার নাম সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতি ও শ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন; ও আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়। সম্মুখস্থ এই টেবিল, কালি ও কাগজ, দীপাধার, প্রদীপ ও দীপশিখা, আসবাব সমেত গৃহপ্রাচীর, রান্নাঘরের ধুঁয়া সমেত পাচকমুখনিঃসৃত ধ্বনি, জানালার বাহিরে নারিকেল গাছ ও তদুপরি নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র উৎকট গ্রীষ্ম ও রাস্তার চতুঃপার্শ্ব হইতে আগত উৎকটতর কলরব— ইত্যাদি মিলিত হইয়া আমার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহা ছাড়িয়া গলি সাহেবের গ্রহ ও নিকলা তেসলার তাড়িত তরঙ্গ, ক্লিফোর্ডের কীট ও মাক্সবেলের ভূত, মধুসূদন দত্তের জীবনলীলা (যাহা সকালে যোগীন্দ্রবাবুর পুস্তকে পড়িতেছিলাম), বেঞ্চের উপরে কাতার দিয়া ছাত্রের শ্রেণী, ও তৎসঙ্গে আগামী ছুটীর দিনের শুভাগমন, এই কয়টা ও ইহা শেওয়ায় আরও কত কি লইয়া আমার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবশিষ্ট জগৎ। ইহাদের মধ্যে কোনটা আমার শ্রুতি, কোনটা আমার স্মৃতি, এবং শেষোক্তটা বোধ করি পরম আনন্দ; কিন্তু কোনটাই বর্ত্তমান শব্দস্পর্শাদিময় অনুভূতি নহে। গোচর

অগোচর উভয়ই আমার পক্ষে ব্যক্ত প্রকৃতির অঙ্গীভূত। গোচর ও অগোচর উভয়ের মাঝে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভবেনা। গোচর অজ্ঞাতসারে অগোচরে লীন হইতেছে; অগোচর আসিয়া অজ্ঞাতসারে গোচরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আমার প্রকৃতির মানচিত্রেরও সীমানা টানিতে পারিনা; তথনি সেই সীমানার রেখা বিস্তার লাভ করিয়া মানচিত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিতেছে; তথনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া আমার নিজের অস্তিত্বের ভিতর মিলাইয়া যাইতেছে। কেন না আমার নিজের অস্তিত্ব এক অর্থে এই মানচিত্রখানার সমব্যাপী। আমি এই মানচিত্রখানা জড়াইয়া আছি; ইহাই আমার মরণকাঠিও জীবনকাঠি। ইহার পরিধির ভিতরেই আমার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ, এবং ইহার পরিমাণেই আমার অস্তিত্বের পরিমাণ।

ব্যক্ত প্রকৃতি অর্থে আমার নিকট কি বুঝায়, তাহা এক রকম বুঝা গেল; এখন এই প্রকৃতির স্বরূপনির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। প্রকৃতি আমার নিকট যে রূপ লইয়া বিদ্যমান, তোমার নিকটেও উহার ঠিক সেই রূপ বর্ত্তমান কিনা, প্রথমে দেখিতে হইবে। পাঁচ জনের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তি পাঁচ রকম কি এক রকম; যদি পাঁচ রকম হয়, তবে সেই পাঁচ রকমের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য আছে কি না, ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

যাহা মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির সহিত আমার সম্বন্ধ ঘটায়, যাহার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকৃতিকে আমি ছুঁইতে পারি, চলিত ভাষায় তাহার নাম ইন্দ্রিয়। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিটাকে আমার সংস্পর্শে আনিবার জন্য আমার পাঁচটা মোটা মোটা জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্ত্তমান। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকেরা যাহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারাও এই অর্থে ইন্দ্রিয়শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা লইয়া তর্ক

উঠিতে পারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি বস্তুতঃ জ্ঞানের আহরণ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে আনুকূল্য করে, তাহার সংশয় নাই। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই মুখ্য-ভাবে জ্ঞানাহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু এই জ্ঞানাহরণ, জ্ঞানের উপার্জ্জন, বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। এই সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের পরিধি অতি-সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিত, সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাদিগকেও ইন্দ্রিয়পর্য্যায়ে স্থান দিলে বিশেষ অপরাধ না হইতে পারে। ইন্দ্রিয় বলিলে যে শরীরের অবয়ববিশেষ বুঝিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই; মনের সেই শক্তি, ধর্ম্ম বা বৃত্তি, যাহার বলে ঐ ঐ জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, অথবা ঐ ঐ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। অন্ততঃ,দার্শনিকেরা ইন্দ্রিয় অর্থে বোধ হয় ইহাই বুঝিতেন। ইংরাজীতে বলিলে ইন্দ্রিয় অর্থে senses মাত্র, organs of sensation নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ছাড়া হিন্দু দার্শ-নিকেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটিকে অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যেমন প্রত্যক্ষ জগতের সহিত সম্বন্ধ, এই অন্তরিন্দ্রিয়েরও সেইরূপ প্রত্যক্ষের পরিধির বহিঃস্থ জগতের সহিত সম্বন্ধ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যেমন জগতের খানি-কটা খুঁজিয়া বেড়ায় ও কুড়াইয়া আনে, অন্তরিন্দ্রিয় তেমনি সেই আহ-রিত অংশটাকে ভাণ্ডারগত করে ও জগতের বাকী অংশটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা বা কর্ম্মবিভাগ লইয়া সূক্ষ্ম পর্য্যা-লোচনার এখানে দরকার নাই। ইন্দ্রিয় দশটাই থাক আর একটাই থাক, তাহাতে কিছু যায় আসেনা; এখানে এই পর্য্যন্ত বলা উদ্দেশ্য যে, জ্ঞান ইন্দ্রিয়পথগামী এবং সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়গণের অবস্থার ও বিকারের বশবর্ত্তী। যাহার ইন্দ্রিয়ের অবস্থা যেমন, প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ তাহার সম্মুখে তদনুযায়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমান। এই কথাটি

অবলম্বন করিয়া আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়ের অবস্থাসম্বন্ধে কোনও দুই মানুষে সম্পূর্ণ ঐক্য নাই; স্থলে স্থলে মানুষে মানুষে দারুণ ব্যবধান। অন্ধ, মূক, বধির, পঙ্গু, খঞ্জ, ইহাদের ত কথাই নাই; সুস্থ সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরস্পর কত প্রভেদ। কে সুস্থ, কে অসুস্থ, বলাই দুষ্কর। রঙ-কাণা মানুষেব সহিত সুস্থ মানুষের তুলনা করিলে, প্রকৃতি কিরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে উভয়ের সমীপে প্রতীয়মান হয়, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। সুস্থ মানুষ তিনটা রঙ দেখে, ও সেই তিনটা রঙ বিভিন্ন পরিমাণে মিশাইয়া আরও নানা রকম রঙ দেখিয়া লয়। রঙ কাণা মানুষ সচরাচর দুইটার বেশী রঙ দেখিতে পায়না; সাধারণতঃ তাহাদের নিকট লাল রঙের অস্তিত্ব বা উপলব্ধি নাই। সেই দুইটা রঙ-মিশাইয়া যত রকম রঙ হইতে পারে, তাহাদের বর্ণের বৈচিত্র্য সেই পর্য্যন্ত। পীত ও অরুণ বর্ণ তাহাদের চোখে সমান; ঘোরাল লোহিতকে তাহারা সবুজ দেখে; এবং আমাদের চোখে যাহা নীলাভ হরিৎ, তাহাদের চোখে তাহা শাদা। বলা বাহুল্য, আমরা যত রকম বর্ণবৈচিত্র্য উপভোগ করি, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত; আমাদের মত বিবিধ সৌন্দর্য্যভোগে তাহারা অধিকারী নহে। বোধ করি, আমরা যাহা নির্ম্মল অকলঙ্ক শ্বেতবর্ণ দেখি, তাহা তাহারা রঞ্জিত দেখে। নিত্য সংসারযাত্রায় তাহাদের বড় বিশেষ অসুবিধা না ঘটিতে পারে, কিন্তু সময়ে সময়ে বড় গোলে পড়িতে হয়। প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ডালটন সাহেবের সম্বন্ধে গল্প আছে, তিনি এক দিন বৃদ্ধাবস্থায় লাল কোর্ত্তা গায়ে দিয়া সহরের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। সময়ে সময়ে ঠকিতেও হয়। ষ্টীমার ও রেলওয়ে বিস্তারের কল্যাণে এমন রঙকাণা অনেক

ধরা পড়িয়াছে। রঙমাত্রে কাণা, এমন ব্যক্তি আছে কি না, ঠিক্ জানি না। যদি থাকে, সে বড় দুর্ভাগ্য জীব সন্দেহ নাই। একরঙা এক-ঘেয়ে জগতে বাস করা চলিতে পারে কি না, সহজে আমাদের ধারণায় আইসেনা।

বিস্তারে, পরিমাণে, সূক্ষ্মতায় তোমার ইন্দ্রিয় আর আমার ইন্দ্রিয় ঠিক্ সমান নহে। সুতরাং প্রকৃতির মূর্ত্তি তোমার নিকট যেমন, আমার নিকট ঠিক্ তেমন নহে। আবার যাহাদের ইন্দ্রিয়ের দুইএকটার অভাব বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষ ছাড়িয়া ইতর জীবে নামিলে আরও বৈষম্য দেখা যায়। পাখীর দৃষ্টি আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ, কুকুরের ঘ্রাণ আমাদের চেয়ে তীক্ষ্ণ; সুতরাং তাহাদের কাছে প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থলবিশেষে অধিক ফুটিয়া আছে। আমরা দুইটা চোখে সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, আবার এমন জীব বিরল নহে, যাহাদের বত্রিশ গণ্ডা চোখ। অনেক কীটের নিকট পৌরাণিক সহস্রলোচন হারি মানেন। আমরা কাণে শুনি আর চোখে দেখি; এমন জীবের কথা শুনা যায়, যাহারা চামড়ায় দেখে আর চুলে শোনে। আমাদের জগতের সহিত এই উৎকট জীবসম্প্রদায়ের জগতের তুলনা করিতে কেহ সাহসী হইবেন, বোধ করিনা।

ইহার পর প্রকৃতির মূর্ত্তি কিরূপ, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক না হইতে পারে। গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা, কে উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন? আমি যেমন দেখি, আমার জগৎ তেমনি; সহস্র-লোচন কীট যেমন দেখে, তাহার জগৎ তেমনি। তাহার জগতে ও আমার জগতে আকাশপাতাল ভেদ। আমার যাহা, তাহা আমার; তোমার যাহা, তাহা তোমার। দুয়ে তুলনা নাই। তোমার শারী-রিক গঠনে আর আমার শারীরিক গঠনে যেমন কতকটা মিল, কত-

কটা গরমিল; সেইরূপ তোমার জগতের রূপে আর আমার জগতের রূপে কতকটা মিল, কতকটা গরমিল। আসল কোন্‌টা, কোন্ বিধাতা বলিয়া দিবেন?

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড পাঠাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়াছিলেন। গল্পটি এখানে উল্লেখযোগ্য। কোনও মহাসমুদ্রে গভীর জলভাগে একজাতীয় প্রাণী সমাজ বাঁধিয়া ঘরকন্না করিত। সেই মহাসমুদ্রের উপরিভাগে যে আর একটা জলহীন বিস্তৃততর জগৎ বিদ্যমান আছে, কেহই তাহার অস্তিত্ব জানিতনা। তাহারা সুখ ও শান্তির সহিত আপনাদের জলময় সংসারে বাস করিত। চির অন্ধকারে বাস করিয়া তাহারা দিবারাত্রির প্রভেদ জানিতনা। একদিন দৈবগত্যা এক ব্যক্তি গভীর জলতল ছাড়িয়া উপরে ভাসিয়া উঠে, এবং উপরে দীপ্ত সূর্য্যালোকভাসিত নূতন জগতের পরিচয় পায়। স্বস্থানে গিয়া সে বন্ধুবর্গকে কহিল, আমাদের জগৎ ছাড়া আর একটা নূতনতরো জগৎ আছে, সেখানে সবই আলো, আর সেখানে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মত অবিসংবাদে গ্রহণ করিল। কালক্রমে আর এক ব্যক্তি সেইরূপ উপরে আসিয়া রাত্রিকালে তারকাখচিত আকাশ নিরীক্ষণ করিল। ফিরিয়া বলিল, আর একটা নূতনতরো জগৎ আছে বটে, কিন্তু সেটা সবই আঁধার, তবে অনেকগুলা প্রদীপ সেখানে মিটিমিটি জ্বলিতেছে। অনেকে তাহার মতও গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই অবধি সেই জীবসমাজ দুই বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অনেক মারামারি রক্তারক্তি করিয়া আসিতেছে। তদবধি আর তাহাদের শান্তিলাভ ঘটে নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল সর্ব্বত্রই বিষাদময়।

প্রকৃতির মূর্ত্তি কিরূপ এই সমস্যা লইয়া আমরাও হাতাহাতি

রক্তারক্তি করিতে পারি। কিন্তু এরূপ বিবাদে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই।

এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যাহার যেমন ইন্দ্রিয়গত অবস্থা, তাহার নিকট প্রকৃতির তেমনি রূপ; যাহার যেমন অনুভূতি, প্রকৃতিরও তাহার নিকট তদনুরূপ মূর্ত্তি। আমি যেরূপ দেখি, তোমাকেও যে ঠিক সেইরূপই দেখিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। ঠিক্ অবিকল সেইরূপ তুমি যে দেখিতে পাওনা, তাহা স্থির। সৌভাগ্যক্রমেই হউক আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক নহে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতাও বড় প্রবল নহে। নতুবা প্রকৃতি হয়ত সম্পূর্ণ বিসদৃশ, সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাদেরই নিকট প্রতীয়মান হইত। প্রাকৃতিক শক্তি সবগুলা আমাদের জ্ঞানোৎপাদনে প্রযুক্ত হয়না। হইলে কি হইত, বলা যায়না। ঈথর বা আকাশের ভিতর দিয়া যে ঢেউগুলি যায়, তাহার মধ্যে যেগুলি ইঞ্চির তেত্রিশহাজার ভাগ অথবা তার চেয়ে কম লম্বা, এবং ইঞ্চির পঁয়ষট্টিহাজার ভাগের চেয়ে বেশী লম্বা, কেবল তাহারাই আমাদের চোখে পড়িলে আলোর জ্ঞান হয়। সেই ঢেউ-গুলির ছোট বড় তারতম্য অনুসারে অনুভূত রঙের তারতম্য জন্মে। কিন্তু যে ঢেউগুলি এই মাপের চেয়ে কিছু বড়, তাহাতে দৃষ্টিকার্য্য একেবারেই চলে না, তবে একটু তাপানুভূতি হয় মাত্র। কিন্তু তার চেয়ে কত লম্বা, দুদশ ইঞ্চি হইতে দুদশ মাইল লম্বা ঢেউ যদি আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে না দৃষ্টি, না স্পর্শ, কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হয়না। এমন বড় বড় কত ঢেউ আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে; আমরা তাহা টের পাইনা। উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে। সেই ঢেউগুলি ধরিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় থাকিলে, না জানি কি রকমে উহারা কত নূতন ধরণের জ্ঞান উৎপন্ন করিতে

পারিত। না জানি প্রকৃতির কি নূতন ধরণের মূর্ত্তি হইত। অন্য কোন জীবের সে রকম ইন্দ্রিয় আছে কি না, ঠিক্ বলা যায়না; মানুষের তাহা থাকিলে সুবিধা হইত কি অসুবিধা হইত, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারিনা। তবে সম্প্রতি মানুষের সেরূপ ইন্দ্রিয় নাই, এই পর্য্যন্ত। থাকিলে প্রকৃতির মূর্ত্তি এমন না হইয়া অন্যরূপ হইত, এই পর্য্যন্ত।

দাঁড়াইল এই। প্রকৃতির মূর্ত্তি কেমন, এ কথার উত্তর নাই; কেন না, প্রশ্নটার ঠিক্ অর্থ হয় না। আমার কাছে প্রকৃতির যেমন মূর্ত্তি, তোমার কাছে ঠিক্ তেমন নহে। আবার কুকুর, বিড়াল, পাখীর কাছে অন্য রকম; আবার কীটপতঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি ঘটনাক্রমে আমার মানসিক ভাবের অকস্মাৎ ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ দুই চারিটা ইন্দ্রিয় বিকৃত বা লুপ্ত, কিংবা দুইচারিটা ইন্দ্রিয় নূতন উদ্গত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মত প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান ছবিখানাও উল্টাইয়া বদলাইয়া যাইবে। তখন হয়ত কমলাকান্তের ন্যায় মনুষ্যকে পতঙ্গ দেখিতে থাকিব। অগ্নিশিখার সহিত কোর্টশিপে প্রবৃত্ত হইব। বীণার ঝঙ্কারে গাত্রজ্বালা ঘটিবে। সূর্য্যের আলোকে কর্ণ বিদীর্ণ হইবে। চন্দ্রলোকে বিহারার্থ প্রাণ ব্যাকুল হইবে। কিন্তু প্রকৃতির সে মূর্ত্তিটা ঠিক্ নহে, আর এইটাই ঠিক, ইহা বলিবার কোনও অধিকার দেখিতে পাইতেছিনা।

তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। আমার জগতে ও পিঁপীড়ার জগতে বড় সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তোমার জগৎ ও আমার জগৎ সম্পূর্ণ এক না হইলেও, উভয়ে কতকটা মিল আছে। যেমন শারীরিক ও মানসিক গঠনে তোমাতে আর আমাতে সম্পূর্ণ এক না হইলেও উভয়ে একটা মিল আছে, যাহাতে উভয়কেই সজাতীয় প্রাণী বলা যায়; সেইরূপ তোমার জগৎ ও আমার জগৎ এই মিলের দরুন অনেকটা

একরকম ও সজাতীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ মিল কতকটা আছে বলিয়াই, তোমার সহিত আমার আহারবিহার চলিতেছে। নতুবা তোমার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিতনা। নতুবা সমাজের সৃষ্টি ঘটিতনা।

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়, তোমার ও আমার অনেকাংশে সদৃশ। দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ (যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়), আর জগতের পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যক্ষ ভাগটা (যাহা অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়), এই দুয়ের আকারপ্রকারেও, সুতরাং তোমায় ও আমায়, কতকটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রত্যক্ষ ভাগটায় যতখানি মিল, অপ্রত্যক্ষ ভাগটার মিল ততখানি নহে। বাহ্য জগতের সহিত, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, উভয়ের সহিত, সম্বন্ধনির্ণয়ে ও তৎপ্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ধর্ম্ম। সুতরাং তোমার আমার ধর্ম্মজ্ঞানে কতকটা বৈষম্য থাকিলেও, আবার অনেকটা সাম্যও রহিয়াছে।

এই সাদৃশ্যটুকু কেন? ইহার উৎপত্তি কিসে? ইহাতে তোমার আমার লাভ কি? এই প্রশ্ন স্বতই আইসে। সঙ্গত উত্তর দিতে হইলে বোধ করি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাছে দৌড়িতে হয়। সমাজবদ্ধ না হইলে মানুষের মঙ্গল নাই। পাঁচটাকে লইয়াই সমাজ। পাঁচটার কাছে প্রকৃতির মূর্ত্তি পাঁচরকম হইলে, পাঁচটার ধর্ম্মভাব পাঁচ রকম হইলে, পাঁচজনের আচারব্যবহার ক্রিয়াপ্রণালীর ভাবগতি বিসদৃশ হইলে, তাহাদের সম্বন্ধবন্ধন ঘটেনা। আমি ক বলিলে তুমি যদি খ বুঝ, দ্বিতীয়বার বলিলে গ বুঝ এবং তৃতীয়বারে বুঝ ক্ত, তাহা হইলে আমি স্বতই তোমাকে পরিহার করিব। সাম্যে সম্মিলন, সম্মিলনে কল্যাণ; আর যাহাতে কল্যাণ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারই অভিব্যক্তি। সুতরাং তুমি, আমি, শ্যাম, হরি, আমরা

সকলে জগৎটাকে যে কতকটা একই ভাবে দেখিতেছি, এবং কতকটা একই ভাবে দেখিয়া জগতের প্রকৃতি, ভাব, প্রতিমূর্ত্তি সেই রকম একটা কিছু, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া আত্মপ্রতারণার পরাকাষ্ঠা পাই-তেছি; ইহা এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলস্বরূপ মনে করিলে বুঝা যায়।

বস্তুতঃ মানবসাধারণের মধ্যে পরস্পর একটা মিলন আছে। আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি জীবনসংগ্রামে টিকিয়া আছে। দুই একটা মানুষ এই সাধারণ পংক্তির বাহিরে কিরূপে ছট্‌কিয়া পড়ে। দুই একটার সহিত সাধারণের মিশ খায়না। তাহাদিগকে আমরা দুটি চক্ষে দেখিতে পারিনা; অথবা তাহাদিগকে আমরা বিষ দেখি। তাহাদিগকে আমরা বিকারগ্রস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যাহারা জগৎ-টাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখে, তাহাদিগকে আমরা জোর করিয়া একটা জায়গায় আবদ্ধ রাখি। জায়গাটার নাম পাগলাগারদ। তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় আমাদের মতে বিকারগ্রস্ত। যাহা-দের বাহ্যজগতের প্রতি আচরণ আমাদের আচরণ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিভিন্ন, তাহাদিগকেও একটা জায়গায় আটকাইয়া রাখি। এই জায়গাটাব নাম জেল। সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাদের স্বতন্ত্র অভিধান ও নামকরণ করিয়া থাকি; যথা চোর, জালিয়াত, নাস্তিক ইত্যাদি। স্থানবিশেষে কাহাকেও বা পোড়াইয়া মারি; যথা জিয়র্দানো ব্রুণো। মনুষ্যের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক সাধারণের অভ্যস্ত পথ হইতে একটু বিচলিত হইয়াছেন; কিন্তু ব্রুণোর পরিণাম গ্রহণ করিতে বড়ই নারাজ।

হর্ম্মান হেলমহোলৎজ।

চারিমাসমাত্র হইল, হেলমহোলৎজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন জানে যে, পৃথিবী হইতে একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলমহোলৎজের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ; কিন্তু হেলমহোলৎজের মত লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে? হেলমহোলৎজ মরিয়াছেন সত্য; কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোটখাট পাহাড় পর্ব্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্দ্ধিত হয়না। হেলমহোলৎজ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্ম্মসংস্থাপনের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেলমহোলৎজ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেলমহোলৎজ জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা করিনা। সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির গত অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড কেলবিন এবিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। মহা-

জনের নামকীর্ত্তনে যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জর্ম্মনির পতসদাম নগরে ১৮২১ সালে হেলমহোলৎজের জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তেয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবেনা।

আমাদের দেশের বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরাজি ব্যাকরণ, ইংরাজি ভূগোল, ইংরাজি ইতিহাস, কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও, গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমনুপ্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে; এমন কি, জগৎচক্রের নিয়মগ্রন্থিও দুই একটা শিথিল হইবার সম্ভব; কিন্তু আমাদের পাঠশালামধ্যে এই প্রাচীন নিয়ম গুলির রেথামাত্র ব্যভিচারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজি সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও গ্রীকলাতিনের অধ্যাপনাসম্বন্ধে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু, 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহা হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেলমহোলৎজকেও ক্লাসে বসিয়া গ্রীকলাতিন গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণনামস্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাঁহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেলমহোলৎজের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই; তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক করিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাষ্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি না, জানিনা। জানিলে, অন্ততঃ আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল; এমন কি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচারা করিতে ভাল বাসিতেন; সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারি শিখিতে হয়। ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইনষ্টিটিউটে ডাক্তারি শিখিয়া সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। তবে ডাক্তারি ব্যবসায়ে সেই মহার্ঘ জীবনের অপব্যয় হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতির জ্ঞানমহার্ণবের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কি পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সহকারিত্ব; পরে অধ্যাপকতা। কনিগস্‌বর্গ, হিদেলবর্গ, বন এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষপর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা? রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশী ও বিদেশী, যার যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটী করে নাই। এরূপ স্থলে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও ঋণশোধের চেষ্টা; কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যাবিষয়ে হেলমহোলৎজ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য; কাহাকে দেখিবে বল? আমাদিগকে দৃষ্টিমাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে গুরুও নাই, শিষ্যও নাই; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদের অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনি ছিল! এমন দিন কি আসিবেনা, যে শিষ্যের মত গুরু ও গুরুর মত শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা যাইবে?

গুরুর প্রবর্ত্তনায় হেলমহোলৎজ অজ্ঞানের তামস রাজ্যে দিগ্বিজয়ার্থ প্রবেশে সাহসী হয়েন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তার পর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানাইব?

সেই সময়ে হেলমহোলৎজ টাইফস জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহার দ্বারা একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজ কাল শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে অণুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জর্ম্মণিতেও তাহা ছিলনা। অণুবীক্ষণ অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেলমহোলৎজ তাহার মধ্যে কয় জন?

যাহা হউক, সেই অণুবীক্ষণ খরিদের পর তাঁহার হাতে যে দুই একটা প্রকাণ্ড কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাকৃটিরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে; বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ওলাউঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল; বাকী অর্দ্ধেক হয়ত দুই দিন পরে ওলাউঠার টীকা লইবে। এবং দেশী ও বিলাতী বৈজ্ঞবর্গের উৎকট অধ্যবসায় সত্ত্বেও, কিছুদিন পরে কুক্কুরদংশনেও টীকা

লইতে হইবে, ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুলা অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে; শয্যাতলে লুক্কায়িতা কালভুজঙ্গিনীও আর যমদূতী নহে; এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাঁড়ি-ভিব্রিও কখন কোন্ অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা এক রকম পূর্ব্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজ কাল শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্। জীবিতব্য কিরূপে ভাবিবার দরকার নাই; জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে—কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।

জীববিদ্যাঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তারের নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয়ত জানেননা যে, এই নূতন মন্ত্রের হেলমহোলৎজই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কিরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সমবায়ে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায় অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্ত্তাটুকু কিছুদিন পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। আজকাল অবশ্য টিণ্ডাল সাহেবের প্রসাদে এইরূপ দুই চারিটা কথার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানেনা, সে কতকটা ত্রেতাযুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে হেলমহোলৎজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অণুবীক্ষণ সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার একমাত্র

কারণ; যেখানে জীবাণুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের সমবায়ে রক্ষিত হইলেও পচিবে না; শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক্ এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ; ইহাতেও জীবাণু বিশেষের অবস্থিতি আবশ্যক; এ সমুদয়ই হেলমহোলৎজ প্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হয়ত সেই সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলমহোলৎজ শর্করা ও জীবাণুর মাঝে একখানি সূক্ষ্ম পরদা রাখিয়া দেখাইলেন যে, পরদাখানি নিঃসৃত রসের সঞ্চার রোধ করিতে পারেনা, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করেমাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে চিনিরও মদ্যে পরিণতি ঘটেনা। সিদ্ধান্ত হইল, এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া; সামান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তারের মহিমান্বিত আবিষ্ক্রিয়াপরম্পরার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলমহোলৎজের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবেনা।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়; নির্জীব জড় হইতে কখনও জীব জন্মিতে দেখা যায় নাই; এই মহাতথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাঁহাদেরই অনেকে অবলীলাক্রমে নির্জীব জড় পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীরী জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েননা। স্বেদ, মল, আবর্জ্জনা হইতে বিধাতার মরজিতে বড় বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহাত আমাদের দেশে

বড় বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস। তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায় স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে হেলমহোলৎজ যাহা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়: তাঁহার পরাক্রমশালী প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তি কিরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোচ্ছেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদবহন তাহাদের কাজ। তাড়িতশক্তি যেমন কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্ত্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সঙ্কেতের আশ্রয় করিয়া বাহিরের বার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করে ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনয়ন করে। মস্তিষ্ক অর্থাৎ হেড আপিস কতকগুলি সঙ্কেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে ও অর্থ আবিষ্কারের পর তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য্য সংবাদপ্রেরণ; তবে এই সংবাদপ্রেরণে সময় আবশ্যক কি না? তাড়িতপ্রবাহযোগে বার্ত্তাপ্রেরণেও কিছু না কিছু সময় দরকার; আলোকেরও সুদূর নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলমহোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকণ্ডে ষাটি হাত মাত্র; তাড়িতপ্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য।

অর্থাৎ কি না, একটা ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্ততঃ এক সেকণ্ড সময় লাগিবে; অথবা এক সেকণ্ড পরে সে বুঝিবে যে, এক বড় একটা প্রাণসংহারক

ব্যাপার উপস্থিত। এবং আঘাতের পরে মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর এক সেকণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রোশ দুই তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিকজ্ঞ মানবক, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীবকর্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি তাহা টের পান ?

বলিতে গেলে আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেলমহোৎজেরই গঠিত; তাঁহারই "হাতে মানুষকরা" ছেলে। হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে শব্দ-বিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটাকতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিলমাত্র। তিনিই সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের সহকারে তাহার উদ্ধতন গ্রামবর্ত্তী স্বরাবলী সমবেত ও জড়িত হইয়া ঐ মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনিত করে; কখন সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে, কখন মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয়; নরকণ্ঠনিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কি কি মৌলিক সুর বাহির করা যায়; কিরূপে যন্ত্রোদ্গত কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন নরকণ্ঠাগত স্বরের উৎপাদন করিতে পারা যায়; ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা; এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দ-সঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যে কিরূপ আণবিক গতি সংঘটিত হয়; হেলমহোলৎজের শব্দবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মহাগ্রন্থপ্রচারের পূর্ব্বে এ সমুদয়ই আঁধার ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী, এবং কিরূপে বায়ুসঞ্চারী ঊর্ম্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন্ অঙ্গে কিরূপে প্রতিহত হইয়া কিরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়; এ সমুদয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বে ছিলনা। স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর

সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে কে তাহার মীমাংসায় সাহসী হইত ?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। বস্তুতঃ হেলমহোলৎজের আবিষ্কৃত দৃষ্টিবিজ্ঞানঘটিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুরীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষার জন্য আজ কাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের একমাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক রহস্য, যাহা সচরাচর আমাদের মনোযোগের ভিতর আইসেনা, তাহা হেলমহোলৎজ প্রথমে দেখাইয়া দেন। রেটিনা নামক স্নায়বিক পরদার গঠন কিরূপ, চোখের পরকলার কোথায় কতটা বক্রতা, দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে কি কি নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দূরদৃষ্টির ও নিকটদৃষ্টির সময়ে কিরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরাইতে ফেরাইতে হয়; কিরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি হয়; কিরূপে পদার্থমাত্রকে দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ, তিনগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে; বর্ণের উজ্জ্বলতায় কিরূপে ছোট জিনিষকে বড় দেখায়; কিরূপে তিনটিমাত্র মূল বর্ণের বোধ স্বীকার করিয়া লইলেই সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধবিধানে সংমিশ্রণদ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝান যাইতে পারে; কিরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক অনুভূতির অভাব ঘটিলে মানুষে রঙ্‌কাণা হইয়া যায়; দৃষ্টিগোচর পদার্থমাত্রেরই কোন্ অংশটা বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন্ অংশটাই বা মানসগোচর মাত্র, অর্থাৎ একটা বস্তুর কতটা আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই; ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেলমহোলৎজ যে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার নামোল্লেখমাত্রে বিবরণ দেওয়াই অসম্ভব।

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, অতি প্রাচীন কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু জ্ঞান কিরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড়প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্ত্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেডআপিসে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সঙ্কেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে, এবং কতক সুন্দর বোধে ও আবশ্যক বোধে গ্রহণ ও কতক অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখসাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কিরূপ আনাগোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্ত্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়; এবং অন্তঃকরণ সেই বার্ত্তাগুলি বা সঙ্কেতগুলিকে কিরূপে গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদানসকলে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলতঃ, এই তিন ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে সচরাচর এক এক ব্যক্তি ইহার একটিমাত্র অথবা একটিরই কোন সঙ্কীর্ণ অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞান-সাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারেন, হেলমহোলৎজ এইরূপ কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন; এবং বোধ করি, এবিষয়ে তিনি মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয়।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; সূক্ষ্মতায় অথবা প্রভাবে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানতঃ শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি।

অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করেমাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয়, ও ইহাদের ক্রিয়া, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি একাকী যাহা করিয়াছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড়জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জ্জগতের এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিষকে আমরা সুন্দর দেখি, কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি? আমাদের এই সৌন্দর্য্যবোধের মূল কি? এই সৌন্দর্য্যবোধ কোথা হইতে আইসে? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহুদিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেলমহোলৎজ হইতে যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, অন্য হইতে তাহা হয় নাই। বস্তুতই হেলম-হোলৎজ আধুনিক মনস্তত্ত্বের ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, ভূতের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ, এই গভীরতর সমস্যার মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেলমহোলৎজই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা সম্বন্ধে হেলমহোলৎজের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। একটা কৌশলময় যন্ত্র বানাইয়া দিলে উহা বিনাশ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সে কালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাসের ধারা অন্তঃসলিল প্রবাহের ন্যায় বহিতেছেনা, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে রসায়নবিজ্ঞানের জন্মদাতা লাবোয়াশিয়ে কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু শক্তিরও যে সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়না, সৎ অসতে পরিণত হয়না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের

মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিলনা; এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় বা না হয়, তাহারও কেহ ধ্রুব নির্দ্দেশে সাহস করিতেননা। শক্তির বহুরূপিতা হেলমহোলৎজের কিছু দিন পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটি দার্শনিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কার্য্য, হেলমহোলৎজেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসাবে মনুষ্যশরীরকে যন্ত্রহিসাবে দেখা যায়। তবে সে কালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনরূপ তুলনা সম্ভবিতনা। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয়; ঘটিকাযন্ত্রে মাঝে মাঝে দম দিতে হয়; কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ একটা কি-জানি-কি অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে কার্য্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলমহোলৎজের লিখিত উক্ত প্রবন্ধপ্রকাশের পর হইতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জীবন একটা কবিজনোচিত কল্পনা-মাত্র, একটা আভিধানিক শব্দমাত্র; কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধানমাত্র। কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলেনা, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রেরও চলিবার সম্ভাবনা নাই, এবং এই উভয় কয়লাই আমাদের সেই চিরপরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌরজগৎ আর একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রাশি রাশি শক্তি বাহির হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগ্‌দিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে, ও তাহারই কণিকামাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্য্যমণ্ডল

হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমুদয়ের কারণ। কিন্তু সূর্য্যের এই অপরিমেয় শক্তি আসিল কোথা হইতে?

হেলমহোলৎজ দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যমণ্ডলের এই শক্তির ভাণ্ডার অমেয় নহে; ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল, এবং এই অজস্র ব্যয়েরই বা পরিণাম কি, হেলমহোলৎজ তাহারও হিসাব দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই হিসাব সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কিরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা গণিবার উপায় হেলমহোলৎজের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে হেলমহোলৎজ কি করিয়াছেন, কিরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।

বিখ্যাত লর্ড কেলবিনের বিখ্যাত vortex theoryর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নাম জড়পরমাণু। হেলমহোলৎজের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ঘর্ষণবর্জ্জিত তরলপদার্থে আবর্ত্তোৎপাদন গণিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বেলাভূমে ঊর্ম্মিরেখার ও বায়ুমধ্যে অলকমেঘের উৎপত্তি হইতে আকাশমধ্যে জড়পরমাণুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝাইতে সেই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেলমহোলৎজ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়াছেন। ইউক্লিডের সময় হইতে মানবজাতি আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতিশাস্ত্র অথবা দেশতত্ত্ব নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজ কাল সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের)

সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশ সর্ব্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান; কে বলিল, ইহা একটি অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। ইহারা সত্য, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার যে, ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে জীবনযাত্রা যেন চলিবেনা, যেন জগৎ-প্রণালী উল্টাইয়া যাইবে, যেন জগৎযন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইবে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট এইরূপ অধিকাংশ সত্যের স্বতঃ-সিদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট, প্রকৃতিবিহিত সত্য বলিয়া মানিতেছ, তাহা প্রকৃত পক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্ত্তৃকই সৃষ্ট বা কল্পিত; মানুষেরই হাতগড়া পুত্তলী। জ্যামিতিশাস্ত্রের মূল সত্য গুলির স্বতঃ-সিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল ক্যাণ্টও সাহসী হয়েন নাই। হেলমহোলৎজ জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। তিনিই প্রথমে দেখান, মনুষ্যের অন্তঃকরণের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই, স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল। স্থানান্তরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।*

---

*"ক্লিফোর্ডের কীট" শীর্ষক প্রবন্ধ।

ক্লিফোর্ডের কীট।

এতদিন আমরা ভাল ছিলাম; অন্ততঃ মনের শান্তি ছিল। ব্যাঘ্রাদি জন্তু মধ্যে মধ্যে লোকালয়ে পদার্পণ করিয়া আমাদের দুই চারিটাকে উদরগত করে, এবং বিছানার নীচে হইতে সাপ বাহির হইয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে আমাদিগকে যমালয় পৌঁছাইয়া দেয়; কিন্তু সভ্যতানামক পদার্থের বিস্তারে ইহাদের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে সকল খেচর কুম্ভীরের বিকট কঙ্কালের চিত্র আমাদিগকে দেখান, সুখের বিষয় যে তাহাদের আর সজীব সরক্তমাংস মূর্ত্তি গ্রহণের সম্ভাবনা নাই; এবং ভরসা আছে যে ব্যাঘ্রাদিও ভাবী মনুষ্যের বিভীষিকা জন্মাইবার জন্য কঙ্কালমাত্র রাখিয়া শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; বাঘের ভয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখন জলের গেলাস মুখে তুলিলেই মনে হয় এই বুঝি জীবলীলা শেষ হইতেছে; কোন্ বাসিলস্ অজ্ঞাতসারে দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের এই নবপরিচিত ক্ষুদ্র জ্ঞাতিগণের বংশবিস্তার ও পরাক্রম দেখিয়া মনে হয়, আমরা যে বাঁচিয়া আছি এই আশ্চর্য্য; অদ্যাপি যে আমরা সগর্ব্ব পদক্ষেপে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত করিতেছি, সে বাসিলস্‌গণের অসামান্য সহিষ্ণুতার পরিচয় ও 'জ্বলন্ত ত্যাগস্বীকারের' পরাকাষ্ঠা বলিতে হইবে। প্রকৃতি মাতার বহু যত্নে লালিত ও যুগান্তরের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তনুখানি এত সহজে বাক্‌টিরিয়া কর্ত্তৃক অঙ্গারাম্ল বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতিমাতা কাঁদেন কি হাসেন বলিতে পারিনা; আমাদের কিন্তু এই আকস্মিক রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে বিশেষ আনন্দের কারণ নাই।

ইহাকেও পারা যায়। কিন্তু মানুষের বহু যত্নের ধন চির-আবিষ্কৃত

জাগতিক রহস্যের তথ্যগুলিরও অবস্থা বিপৎসঙ্কুল দেখিলে মনে আর শান্তি থাকেনা। যেগুলিকে চিরন্তন সনাতন অবিনাশী সত্য বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি, বহুযুগের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণায় মানুষ যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে, যখন দেখা যায় সেই সত্যগুলিও অবিনাশী নহে, মানুষের ক্ষণভঙ্গুর দেহের ন্যায় নশ্বর; মানুষ তাহাদের আবিষ্কার করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছেমাত্র, এবং অপরাপর সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহাদেরও বিনাশাশঙ্কা বর্ত্তমান; তখন আর শান্তি থাকিবে কিরূপে?

আকাশ অসীম, এই একটা মানুষের চিরপরিচিত সত্য। ইংরাজিতে যাহাকে space বলে, সেই অর্থে আকাশ বলিতেছি। এখানে আকাশ অর্থে কেহ যেন শূন্যব্যাপী আলোকবাহী ঈথর না বুঝেন। এই সত্যটার সম্বন্ধে কাহারও কখন সংশয় ছিলনা। আকাশের কি আবার সীমা আছে? আকাশের আবার পরিধি আছে? এও কি কখন হয়? অত, বড় মনীষী ইমানুয়েল ক্যাণ্ট, যিনি মানুষের নানাবিধ দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূলে সবলে আঘাত করিয়া গিয়াছেন, এই সংস্কারটাকে আক্রমণ করিতে তাঁহারও সাহস হয় নাই। আকাশের সীমা নাই— এই কথাটাকে তিনিও মানুষের মনের অবস্থার নিরপেক্ষ সনাতন সত্য necessary truth, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আকাশের অনন্তত্ব লইয়া আমরাই কত দীর্ঘচ্ছন্দ ভাবগম্ভীর বক্তৃতা করিয়াছি; দুঃখের বিষয়, এই সত্যটার শরীরেও বাসিলস্ ধরিয়াছে। এই বাসিলস্ ক্লিফোর্ডের কীট।

ক্লিফোর্ডের কীট কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিবেও না; অণুবীক্ষণযন্ত্র এখানে পরাস্ত। এই কীট মানুষের জাতিগণ-মধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং জীবতত্ত্ববিদেরা ইহার জাতিকুল নিরূপণে অসমর্থ। অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের কল্পনাকে ইহার জননী না বলিলেও পালয়িত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার

আকৃতিও কিছু অদ্ভুত গোছের। অত বড় হাতীটা হইতে অত ছোট জীবাণু পর্য্যন্ত সকলেরই শরীরের দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে, বেধ আছে; ইহার কেবল আছে দৈর্ঘ্য; বিস্তারও নাই, বেধও নাই। জ্যামিতিশাস্ত্রে বিস্তার-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ্যমাত্রময় রেখানামক জিনিষের কল্পনা আছে। ক্লিফোর্ডের কীটের শরীর ক্ষুদ্র একটু রেখামাত্র। ইহার লীলাভূমিও ইহার শরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধময় ত্রিগুণ জগতে বিচরণ করি, এও তেমনি সচ্ছন্দে দৈর্ঘ্য-মাত্রসার একটি বৃত্তপথে চলিয়া বেড়ায়। সেই বৃত্তটি অথবা সেই বৃত্তের পরিধিটিই তাহার জগৎ। সেই বিস্তারহীন জগতে তাহার বিস্তারহীন শরীর লইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। হইতে পারে তাহার অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি বুঝি মানুষেরই মত পরিস্ফুট; কিন্তু তাহার সমুদয় জ্ঞান সেই ক্ষুদ্র বৃত্তপরিধিতেই সীমাবদ্ধ। তাহার বৃত্তপথের অর্থাৎ তাহার নিজ জগতের বাহিরে যে আর একটা বিশালতর জগৎ আছে, যাহাতে চন্দ্রসূর্য্য নির্দ্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাতে বাক্‌টিরিয়া নামক জীবের বংশবৃদ্ধির জন্য মনুষ্যনামক জীব অবস্থান করিতেছে, সে জগতের কোন সংবাদ সে রাখেনা; সেই জগতের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানপ্রাপ্তির তাহার উপায় নাই। কিরূপেই বা সে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে? তাহার অবয়ব, তাহার ইন্দ্রিয়, তাহার মনোবৃত্তি সমুদয়ই তাহার আপন রেখাময় জগতের অনুরূপ; বহিঃস্থ বৃহত্তর জগতের সম্বন্ধে জ্ঞানের আহরণোপযোগী কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার নাই; সেরূপ কোন ইন্দ্রিয় তাহার থাকিবার প্রয়োজনই হয় নাই। কিন্তু সে নিজের জগতের প্রভু। সেইখানে মনের আনন্দে সে এদিকে ওদিকে অথবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচরণ করে; সজাতীয় কীটদের সহিত আহারব্যবহার করে; এবং চির জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ

সীমাবদ্ধ বিহারভূমির শেষ সীমা না পাইয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করে, যে তাহার জগতের সীমা নাই।

ক্লিফোর্ডের কীটের এই স্থির সিদ্ধান্তে আমাদের হাসিবার অধিকার আছে; কিন্তু হাসির সঙ্গে একটু শিক্ষালাভও হইতে পারে। আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত পিশাচ বুদ্ধিবিষয়ে যেমনই হউক, ক্ষমতাবিষয়ে বড় যে সে ছিল না; আপনার অত বড় শরীরটা ইচ্ছামাত্রে সঙ্কীর্ণ করিয়া ছোট কূপীর ভিতর পূরিয়াছিল। কিন্তু সেও আপনার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধযুক্ত শরীরটাকে কেবল দৈর্ঘ্যমাত্রে পরিণত করিয়া একটি ইউক্লিডের রেখার ভিতর পূরিতে পারিত কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের ত কথাই নাই। যাহা হউক আমরা রেখার ভিতর বাস করিতে না পারি, রেখার কল্পনা করিতে পারি; শুধু রেখা কেন, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এই দুই গুণযুক্ত, অর্থাৎ দ্বিধা বিস্তৃত স্থান,—যেমন কোন পদার্থের পিঠ অথবা তল,—তাহারও কল্পনা করিতে পারি। ইউক্লিডের প্রসাদে স্কুলের ছাত্রমাত্রই এই দুই কল্পনায় পটু। দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, এই তিন গুণযুক্ত অর্থাৎ ত্রিধা বিস্তৃত দেশ,—তাহার কল্পনার প্রয়োজন নাই;—সেরূপ দেশে ত আমরা বাসই করিতেছি।

আমাদের যে জগৎ, আমরা যাহাকে আকাশ বলি, যে আকাশের একটু না একটু অংশ ব্যাপিয়া আমাদের শরীর অবস্থিত ও আমাদের জ্ঞানগোচর পদার্থমাত্রই অবস্থিত, তাহাই এই তিনগুণযুক্ত ত্রিধা বিস্তৃত দেশ। কিন্তু এই তিন গুণের বেশী চারিটি গুণ আমরা আর বুঝি না; তিন দিকে প্রসারিত ব্যতীত চারিদিকে প্রসারিত—চতুর্ধা বিস্তৃত—দেশ আমাদের কল্পনাতেই আসেনা। দৈর্ঘ্যময় রেখা কল্পনায় আসে; দৈর্ঘ্যবিস্তারময় তল কল্পনায় আসে; দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধময় দেশ ত আমাদেরই বাসভূমি। কিন্তু দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ শেওয়াই আরও

একটা পৃথক্ গুণযুক্ত দেশ থাকিতে পারে; আমাদের জগৎটার চেয়ে আরও একটা প্রশস্ততর জগৎ থাকিতে পারে; তার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের নাই; সেরূপ জ্ঞান লাভের কোন উপায়ই নাই; সে আমাদের কল্পনারও অতীত। কল্পনার অতীত বটে; কিন্তু সেরূপ জগৎ নাই কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? ক্লিফোর্ডের কীটও ত আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জগতের অস্তিত্ব, কল্পনা করিতে পারেনা। যাহা তাহার জ্ঞানসীমার ভিতরে, তাহাই তাহার কল্পনার আয়ত্ত; যাহা তাহার জ্ঞানের সীমার বাহিরে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। কে জানে যে আমাদের অবস্থা ক্লিফোর্ডের কীটের মত নহে? কে বলিতে পারে আমাদের জগৎ আর একটা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন নিয়মে চালিত, ভিন্ন জীবাধ্যুষিত, বৃহত্তর জগতের ভিতরে নিহিত নয়? কে বলিতে পারে যে আমরাও ক্লিফোর্ডের কীটের মত নিজ সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরিধিযুক্ত, ক্ষুদ্র জগতে বাস করিতেছিনা, এবং আমাদের এই প্রত্যক্ষ, সীমাবদ্ধ মনোবৃত্তির প্রকাশস্থল, সসীম জ্ঞানের বিষয়ীভূত, সীমাবদ্ধ জগৎটাকে অসীম ভাবিয়া আস্ফালন করিতেছিনা? আমরা ইহার সীমা পাই নাই বলিয়া, এ জগতের সীমা নাই, এ কিরূপ বিচার?

ক্লিফোর্ডের কীটের অবস্থা ভাবিলে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলির স্বতঃসিদ্ধতা ও সনাতনতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় আসিয়া পড়ে। এই স্বতঃসিদ্ধগুলি আমাদের জ্ঞানায়ত্ত আকাশের ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের উপার্জ্জিত সিদ্ধান্তমাত্র। আমাদের আকাশের যতটুকু আমরা দেখিতে পাই, এই আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানের ভিতরে আছে, ততটুকুতেই এই ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান; এবং আমরা যতদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি, অতীতের যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে পাই, ততদিন এই ধর্ম্মগুলির কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই; এই পর্য্যন্তই

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আকাশের সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম বিদ্যমান, অথবা এই ধর্ম্মগুলি সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া এইরূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়াছে; এতদূর বলাও মানুষের পক্ষে প্রগল্‌ভতা।

রুশীয় পণ্ডিত লবাচুস্কী ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলি বর্জ্জন করিয়া নূতন জ্যামিতিশাস্ত্র গঠন করেন। জর্ম্মনির রাইমান ও মনুজসিংহ হেলমহোলৎজ তৎপরে এই সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক ক্লিফোর্ড ইংলণ্ডে এই মতের বিস্তার করেন। ক্লিফোর্ডের অকালমৃত্যু না হইলে আমরা আরও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইতাম।

প্রাচীন জ্যোতিষ।

এসিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনকাল হইতে ইউরোপের লোকে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করেন। আমরা আমাদের অতীতের গুণগৌরবে এত মুগ্ধ, যে সে কালে কি ছিল না ছিল, অনুসন্ধানের তত প্রয়োজন দেখিনা। তবে ইংরেজ লেখকের তর্জমা অথবা প্রবন্ধ হইতে দুই চারিটা বাক্য সঙ্কলন করিয়া সেই ভিত্তির উপর পদনির্ভর করিয়া প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে সংশয় নাই। কে বলে আমাদের কোপর্নিকস ছিলনা! কে বলে আমাদের নিউটন ছিলনা!

যাহা হউক, এপর্য্যন্ত ইউরোপে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি কল্পান্ত পর্য্যন্ত যেখানে যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইবে, তৎসমুদয়ই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে কোন না কোন নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে, ইহা একরকম আমাদের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং সেই সঙ্গে ইউরোপে বা অন্যত্র এ পর্য্যন্ত কি আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, এবং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের কোন্ অন্ধকার গুহায় কোন্ তথ্য লুক্কায়িত আছে না আছে, এসম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ইহাও এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল এসম্বন্ধে দুই চারিটা স্থূল কথা পাঠকের সমীপস্থ করিবার পূর্ব্বে মার্জ্জনাভিক্ষা আবশ্যক। তথাপি, প্রাচীন কালের অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রাচীন কালের জ্ঞানার্জ্জনপন্থার সহিত আমাদের অধুনাতন জ্ঞানের পরিমাণ ও জ্ঞানার্জ্জনপন্থার তুলনা করিলে পদে পদে শোচনীয় ভয়াবহ অধঃপত-

নেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত কোথায় সে দিন, উচ্চারণ না করিয়া থাকা যায়না।

কিরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে প্রাচীনেরা জ্যোতিষ্কগণের স্থিতি গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কিরূপে অনুমান বা hypothesis নির্ম্মাণ দ্বারা তাহাদের স্থিতি গতি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, কিরূপ উৎকট গণিত প্রয়োগে তাহাদের স্থিতি গতি গণনা করিতেন, ও কিরূপেই বা গণনার সহিত পর্য্যবেক্ষিত ফলের সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস পাইতেন, তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। সে কালের জ্যোতিষশাস্ত্রের দুই চারিটা স্থূল কথা বিবৃত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রথম, পৃথিবীর আকার। বলা বাহুল্য পৃথিবীর আকার ও আয়তনের নিরূপণ জ্যোতিষের প্রথম বিষয়।

পৃথিবীর ত্রিকোণাকৃতি সম্বন্ধে বড় বড় লোকের বড় বড় যুক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর অবয়বের গোলত্ব অতি প্রাচীন কালেই স্থির হইয়াছিল। গোলত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি আজ কাল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখনও ঠিক্ সেই সেই যুক্তি প্রদত্ত হইত। যথা, পৃথিবী গোল না হইলে দৃষ্টিপ্রতিষেধক ক্ষিতিজ রেখা বা চক্রবাল রেখা (horizon) সর্ব্বত্র বৃত্তাকার হইতনা; গোল না হইলে উত্তরমুখে গমনকালে উত্তরস্থ নক্ষত্রগণের ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষিত হইতনা; গোল না হইলে চন্দ্রগ্রহণকালে দৃষ্ট পৃথিবীর ছায়া বৃত্তাকার হইতনা; ইত্যাদি।

ভূগোলপৃষ্ঠ বিবিধ কল্পিত রেখা দ্বারা বিভক্ত হইত। অবস্থিতি, দূরত্বনির্দ্দেশ, উদয়াস্তকালের অন্তর, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য এইরূপ রেখার কল্পনা এক্ষণে আবশ্যক হয়, তখনও আবশ্যক হইত। ভূগোলে সুমেরু কুমেরু দুইটি বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়া উভয়স্থান

হইতে সমদূরবর্ত্তী পরিধিটি নিরক্ষবৃত্ত অভিহিত হইত। স্থানবিশেষ হইতে উত্তরদক্ষিণবর্ত্তী সুমেরুকুমেরু-ভেদী একটি বৃত্ত আঁকিয়া মধ্যরেখা নিরূপিত হইত। নিরক্ষবৃত্ত হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অক্ষাংশ ও মধ্যরেখা হইতে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দেশান্তর, এই উভয়বিধ দূরত্ব নির্দ্ধারণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। বলা বাহুল্য এখনও ঠিক্ এই উপায়ে বিভিন্ন স্থানের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা জানি, ভূমণ্ডল সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার নহে, নিরক্ষপ্রদেশ সমীপে কিঞ্চিৎ স্ফীত, ও মেরুপ্রদেশে "কিঞ্চিৎ চাপা"। এই স্ফীতির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য মোটামুটি দুইটা উপায় আছে। প্রথম, নিরক্ষ-প্রদেশের নিকটে দশ মাইল বা দশ যোজন পথ উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুব-তারা যতখানি উন্নত হয়, মেরুপ্রদেশসমীপে দশ মাইল বা দশ যোজন পথ উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুবতারা ঠিক্ ততখানি উন্নত হয়না। পৃথিবী ঠিক্ বর্ত্তুলাকার হইলে উভয়ত্রই সমান উন্নতি লক্ষিত হইত। দ্বিতীয়, নিরক্ষপ্রদেশে পেণ্ডুলম বা পরিদোলক যন্ত্র এক মিনিটে যতবার দোলে, মেরুপ্রেদেশে পেণ্ডুলম তাহার অপেক্ষা কিছু বেশীবার দোলে। সেকালে পেণ্ডুলমের ব্যবহার ছিলনা, এবং স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া ধ্রুব-তারার উন্নতি দেখিবারও সুবিধা ছিলনা। সুতরাং ভূমণ্ডল ঠিক্ বর্ত্তুলা-কার বলিয়াই গৃহীত হইত। কিন্তু তাহাতে বড় আসে যায়না; কেননা সে সেকাল আর এ একাল।

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ঠিক্ উত্তরদিক্ নিরূপণ করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। ঠিক্ মধ্যাহ্নকালে ভূপৃষ্ঠে একটি যষ্টি খাড়া করিয়া তাহার ছায়া দেখিলে এই দিক্ নিরূপিত হইতে পারে। তবে ঠিক্ মধ্যাহ্নকাল অথবা মধ্যাহ্নক্ষণের নিরূপণ দুর্ঘট ব্যাপার। একটি সূচীরু

সহজ কৌশলে এইটি নিরূপিত হইত। 'অম্বুসংশুদ্ধ' (অর্থাৎ যাহার পৃষ্ঠদেশ স্থির অম্বুপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল, এইরূপ) শিলাতলে শঙ্কু দণ্ডায়মান রাখিয়া পূর্ব্বাহ্ণে যে কোন সময়ে ছায়ার গায়ে গায়ে রেখা টান। অপরাহ্ণে যখন ছায়া ঠিক্ আবার সমান দৈর্ঘ্যযুক্ত হইবে, সেই সময়ে ছায়ার গায়ে আর একটি রেখা টান। এই দুই রেখার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোণকে জ্যামিতিশাস্ত্রোক্ত উপায়ে দ্বিখণ্ডিত করিলেই মধ্যাহ্নকালের ছায়া রেখা পাওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক এই উপায়ে উত্তরদক্ষিণ দিক্ নির্ণয় করিলে একটু ভুল থাকে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ মধ্যে সূর্য্যের গতির ব্যত্যয় তাহার প্রধান কারণ। সুতরাং আজি কালি উত্তর দিক্ নির্ণয়ে আরও সূক্ষ্মতর উপায় ব্যবহৃত হয়। সে যাই হউক, উল্লিখিত "অম্বুসংশুদ্ধ" শব্দটির গভীরার্থকতা অনুধাবন করিলেই সে কালের জন্য উষ্ণশ্বাস আপনা হইতে নির্গত হয়।

ভূপৃষ্ঠে কোনস্থলের অবস্থাননির্দ্দেশের জন্য সেই স্থলের অক্ষাংশ (latitude) অবধারণ আবশ্যক। প্রধানতঃ দুই উপায়ে অক্ষাংশ অবধারিত হইত। প্রথম, ক্ষিতিজরেখা বা চক্রবাল হইতে ধ্রুবতারার উন্নতি নির্দ্ধারণ; দ্বিতীয়,যে দিন দিবারাত্রি সমান হয়, সেই দিন মধ্যাহ্নে নভোমণ্ডলে ঊর্দ্ধস্বস্তিক বিন্দু হইতে, অর্থাৎ যে বিন্দু ঠিক্ মস্তকের ঊর্দ্ধে রহিয়াছে (*zenith*), সেই বিন্দু হইতে,সূর্য্যমণ্ডলের অবনতিনিরূপণ। বলা বাহুল্য ভূগোলের নিরক্ষদেশের স্ফীতিটুকু উপেক্ষা করিলে অক্ষাংশনির্দ্ধারণের এই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অক্ষাংশ নিরূপণের এই উপায়ই শিখাইয়া থাকি। প্রয়োগের সময় যে সকল সাবধানতা বা সংশোধন আবশ্যক, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

ঊর্দ্ধস্বস্তিক হইতে সূর্য্যের অবনতি চক্রযন্ত্র দ্বারা সহজেই বাহির হইত। আর একটা কৌশল ব্যবহৃত হইত। নির্দ্দিষ্টদৈর্ঘ্যযুক্ত

শঙ্কু প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়ার পরিমাণের দ্বারা সূর্য্যের অবনতি গণিত হইত। *

তার পর পৃথিবীর আয়তন। অক্ষাংশ নিরূপিত হইলে পৃথিবীর পরিধি কত মাইল কি কত যোজন, তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। একালেও এই উপায়, সেকালেও এই উপায়। মনে কর কৃষ্ণনগর কলিকাতার ঠিক্ উত্তরে। কৃষ্ণনগরের অক্ষাংশ হইতে কলিকাতার অক্ষাংশ বাদ দিলেই উভয়ের অক্ষান্তর কত অংশ পাওয়া গেল। তার পর কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা কত মাইল মাপিয়া দেখ। সুতরাং এত অংশ অক্ষান্তরে এত মাইল ব্যবধান স্থির হইল। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত। তার পর ত্রৈরাশিক; এক অক্ষ-অংশে যদি এত মাইল, ৩৬০ অংশে কত মাইল হইবে। পৃথিবীর পরিধি কত মাইল এইরূপে বাহির হয়। আর্য্যভট্টের গণনায় পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন; এক যোজনে চারি ক্রোশ, ও দশ ক্রোশে উনিশ মাইল, এই হিসাবে আর্য্য-ভট্টের মতে ভূপরিধি ২৫০৮৫ মাইল। বর্ত্তমান কালের গণনায় পরিধি ২৪৯০০ মাইল। পরিধি হইতে ব্যাস ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাহির হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, ব্যাসকে পরিধির পরিমাণ দিয়া গুণ করিলেই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। এই হিসাবে কোন ভুল নাই। পরিধির সহিত ব্যাসের সম্বন্ধ বাহির করিতে গণিতবেত্তৃগণকে অনেক কষ্ট

---

* এইরূপ গণনা ত্রিকোণমিতির বিষয়। জ্যোতিষিক গণনার জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতির সৃষ্টি ও চর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল। উক্ত গণনায় একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভুজ ও কোটির পরিমাণ হইতে কোটির সম্মুখীন কোণের পরিমাণ গণিতে হয়। সম্প্রতি এইরূপ স্থলে দুইটি রেখার পরিমাণ হইতে একটি কোণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ আবশ্যক হইলে উচ্চগণিতসম্মত বিশ্লেষণক্রিয়া দ্বারা যত দূর ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে ফল বাহির করা যাইতে পারে। ভাস্করপ্রণীত প্রাচীন গ্রন্থে যে কোণ গণনার হিসাব দেওয়া আছে, তাহাতে গণনা করিলে বেশী ভুল হয়না

পাইতে হইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্বন্ধ যতদূর ইচ্ছা সূক্ষ্মতার সহিত বাহির করা যাইতে পারে। মোটামুটি উভয়ের সম্বন্ধ ২২ : ৭ ধরা যায়। আর্য্যভট্ট সেই হিসাবই ধরিয়াছেন। কেহ কেহ আরও স্থূল হিসাবে পরিধির বর্গকে ব্যাসের বর্গের দশগুণ ধরিয়া লইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য আরও সূক্ষ্ম ধরিয়া ৩৯২৭ : ১২৫০ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

নিরক্ষদেশের উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানে নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল একটি বৃত্ত ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত করিলে তাহাকে স্ফুট পরিধিবৃত্ত বলে। ইহার ইংরাজি নাম parallel of latitude; এই বৃত্ত নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে লওয়া যাইবে, ততই ইহার পরিমাণ ছোট হইবে। কলিকাতার অক্ষাংশ, অর্থাৎ কলিকাতা নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত অংশ উত্তরে, জানা থাকিলেই কলিকাতার স্ফুটপরিধিবৃত্তের পরিমাণ জানা যায়। বলা বাহুল্য এই স্ফুটপরিধির পরিমাণের উপায় সেকালে জানা ছিল। কলিকাতার কত ক্রোশ পূর্ব্বদিকে কয় দণ্ড আগে সূর্য্যোদয় হইবে, নির্দ্ধারণের জন্য এই স্ফুট পরিধি পরিমাণের প্রয়োজন।

ইংরাজেরা গ্রীণবিচ নগরের মধ্য দিয়া ভূগোলের মধ্যরেখা কল্পনা করেন, এবং সেই মধ্য রেখার পূর্ব্বে বা পশ্চিমে অন্য স্থানের দেশান্তর বা longitude মাপিয়া থাকেন। সেকালে মধ্যরেখা উজ্জয়িনী নগর ভেদ করিয়া কল্পিত হইয়াছিল, এবং সেইখান হইতে অন্যান্য স্থানের দেশান্তর পরিমিত হইত।

তার পর পৃথিবীর গতি। আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিলে সে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতির কথা এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করিবে। তবে উভয় গতির পক্ষে প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর প্রাওয়া কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের বোধ হয় যেন সমুদয় নক্ষত্রচক্র প্রত্যহ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; পৃথিবী সেই নক্ষত্র

চক্রের কেন্দ্রগত। পৃথিবী ঘুরিতেছে, নক্ষত্রচক্র স্থির আছে, কি নক্ষত্রচক্র ঘুরিতেছে ও পৃথিবী স্থির আছে, ইহা লইয়া বিতণ্ডা একালেও যেমন চলিয়াছিল, সেকালেও তেমনি চলিয়াছিল। একটা পৃথিবী ঘুরিতেছে মনে করিলেই যখন চলে, তখন ঐ প্রকাণ্ড নক্ষত্রচক্রটা ঘুরাইবার দরকার কি, সাধারণতঃ এই ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ফলতঃ এই যুক্তি এক রকম অকিঞ্চিৎকর; ইহাতে মীমাংসা কিছুই হয়না। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্য প্রবল প্রমাণ আছে; ফুকো সাহেবের উদ্ভাবিত পেণ্ডুলম তাহার অন্যতম। কিন্তু সেকালে, যখন বলবিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই, তখন এ প্রমাণ প্রয়োগের অবকাশ ছিলনা। আর্য্যভট্ট তীক্ষ্ণদৃষ্টিবলে বলিয়াছিলেন পৃথিবীই ঘুরিতেছে; নক্ষত্রচক্রের আবর্ত্তনস্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আর্য্যভট্টের এই মত বাহাল থাকে নাই। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আমল দেন নাই। তবে আর্য্যভট্টের মতের অস্বীকারে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বা অসুবিধা সেকালে অনুভূত হয় নাই। আর্য্যভট্টের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা আজ কাল বালকোচিত বোধ হইতে পারে, ও হাস্যোদ্রেকও করে। তবে গালিলিও নিউটনের পূর্ব্বে সে সকল যুক্তির ঠিক্ সঙ্গত উত্তর মিলিবার সম্ভাবনাও ছিলনা।

পৃথিবীই ঘুরুক, আর নক্ষত্রচক্রই ঘুরুক্, এই আবর্ত্তনে সূর্য্যের এবং গ্রহনক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদিত হয়। এবং সূর্য্যের উদয়াস্তেই দিবারাত্রি। দেশবিদেশে দেশান্তর অনুসারে অর্থাৎ মধ্যরেখা হইতে দূরত্ব অনুসারে উদয়কালের যে তারতম্য হয়, তাহা যে সহজেই গণিত হইত, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

নক্ষত্রেরও উদয়াস্ত আছে, এবং সূর্য্য ও গ্রহগণেরও উদয়াস্ত

আছে। কিন্তু এই উভয়জাতীয় জ্যোতিষ্কের মধ্যে উদয়াস্ত বিষয়ে বড়ই তফাত আছে। নক্ষত্রমাত্রই ঠিক্ এক সময়ে এক পাক ঘুরিয়া আসে। কিন্তু সূর্য্যের এক পাক ঘুরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হয়। আজ সকালে যদি দেখিয়া থাকি, কোন একটি নক্ষত্র ও সূর্য্য ঠিক্ এক সঙ্গে উদিত হইল, কাল দেখা যাইবে সেই নক্ষত্রটি একটু আগে উঠিল, আর সূর্য্য যেন একটু পিছাইয়া গিয়া একটু পরে উঠিল। ফলে সূর্য্য প্রত্যহই একটু একটু করিয়া পিছাইয়া সংবৎসরে সমুদয় নক্ষত্রচক্রটাই পিছাইয়া যায়। আজ যে নক্ষত্রের নিকট সূর্য্যকে দেখিয়াছিলাম, সেই নক্ষত্র হইতে সূর্য্য প্রত্যহ একটু একটু পূর্ব্বমুখে সরিয়া আবার এক বৎসর পরে সমগ্র নক্ষত্রচক্রটা ঘুরিয়া ঠিক্ সেই নক্ষত্রের নিকট উপস্থিত হয়, ও পুনরায় পিছাইতে থাকে। ফলে আমাদের বোধ হয় যেন নক্ষত্রচক্র প্রত্যহই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে, সূর্য্যও সেই সঙ্গে ঘুরিতেছে; তবে সূর্য্য নক্ষত্রগুলির সঙ্গে ঠিক্ সমান বেগে না গিয়া একটু একটু পূর্ব্বাভিমুখে পিছাইতেছে। একখানি গাড়ীর চাকা যেন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, ও তাহার পরিধির উপরে একটি পিপীড়া যেন অন্যমুখে ধীরে ধীরে চলিতেছে।

সূর্য্যের গতি এই রকম। বুধশুক্রাদি গ্রহগণের গতি আরও গোলমেলে। ইহারাও প্রত্যহ নক্ষত্রচক্রের সঙ্গে ঘুরে, এবং সূর্য্যের মত ক্রমশঃ পিছাইয়া যায়। সূর্য্য পিছায় বটে, কিন্তু প্রতিদিন প্রায় সমান পরিমাণেই পিছায়। গ্রহগুলির পক্ষে একথা খাটেনা। ইহারা কেহ বা খুব দ্রুতগতিতে পিছু চলে, কেহ বা মন্দ গতিতে পিছু চলে। বুধ ও শুক্র খুব দ্রুত চলে; বৃহস্পতি ও শনি খুব ধীরে চলে। সূর্য্যের সমুদয় নক্ষত্রচক্র ঘুরিতে এক বৎসর সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতি প্রায় বার বৎসরে নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসে। শুধু তাহাই নহে; বুধ ও শুক্র,

নক্ষত্রচক্রে স্বতন্ত্রভাবে চলে বটে, কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া পূর্ব্বে বা পশ্চিমে অধিক দূরে যায় না; উহারা যেন কোনরূপে সূর্য্যে বাঁধা আছে। অন্য গ্রহগুলির পক্ষে তাহা নয়। কিন্তু ইহারা আবার পূর্ব্বমুখে পিছাইতে পিছাইতে দুই চারি দিনের জন্য আবার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। বেশ পূর্ব্বমুখে চলিতে ছিল; চলিতে চলিতে যেন অকস্মাৎ কিছুকালের জন্য অন্যমুখ হইল।

সুতরাং গ্রহগণের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। গ্রহগণের অবস্থিতির ও গতির গণনাই যখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তখন এই জটিলতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফল বাহির করিতে পারিলেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা সার্থক হয়।

সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন সহসা এই জটিলতার আবরণ মুক্ত হয়; এই দুর্গম গহন পথ পরিষ্কৃত হয়; আঁধার দেশ আলোকিত হয়। মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসে সেই দিন চিরস্মরণীয় হইবে; এবং যে ব্যক্তি শুভ্র আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া এই নিবিড় তিমির ভেদ করেন, তিনিও চিরজীবী হইবেন। এই ব্যক্তির নাম নিকলাস কোপর্ণিকস।

যদি ধরা যায় নক্ষত্রচক্র স্থির আছে, এবং সূর্য্য স্থির আছে, এবং বুধ, শুক্র, পরে পৃথিবী, ও পরে মঙ্গলাদি সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে গ্রহগণের আকাশভ্রমণের যত কিছু জটিলতা সমুদয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, এবং কোন্ গ্রহ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে থাকিবে, গণনা অবোধ বালকেরও আয়ত্ত হইয়া উঠে। কোপর্নিকস পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সূর্য্যকেন্দ্রক গতির আবিষ্কর্ত্তা। তাহার পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

আমাদের আর্য্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক গতির আবিষ্কার করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক সূর্য্যকেন্দ্রক গতির সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, পূর্ব্বে এদেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্থিতি গণিত হইত, এবং এত জটিলতা সত্বেও যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ফল নিষ্কাশিত হইত, তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে। সেই বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখিলে একদিকে বাহবা না দিয়া থাকা যায় না; ও অপরদিকে যখন দেখা যায়, তাঁহারা অসীম পরিশ্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পাহাড় কাটিয়া সহস্র পদস্খলন এড়াইয়া বিপুলবিক্রমে দুর্গম শৈলশিখরেব সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কেবল আর একটা লাফ দিতে পারিলেই শৈলশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল বায়ুস্তর মধ্য দিয়া দিগন্তপর্য্যন্ত দৃষ্টিরেখাবর্ত্তী ও আলোকিত দেখিতে সমর্থ হইতেন; তখন আর পরিতাপের ইয়ত্তা থাকেনা।

সেকালে কিরূপে গ্রহগণের অবস্থিতি নির্ণীত হইত, দুই একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে কর বুধ গ্রহ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সূর্য্য পূর্ব্বমুখে এক বৎসরে অর্থাৎ প্রায় তিনশতপঁয়ষট্টিদিনে একবার নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসে। বুধগ্রহ ঠিক্ নক্ষত্রচক্রে ঘুরেনা। বুধগ্রহ একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে প্রায় ৮৮ দিনে এক পাক ঘুরিয়া থাকে। আর সেই নির্দ্দিষ্ট বিন্দুটি যেন স্থির না থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে নক্ষত্রচক্রে এক পাক ঘুরিয়া আসে। সেই বিন্দুটি এক বৎসরে পৃথিবীকে ঘুরিতেছে, আর বুধগ্রহ সেই বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ৮৮ দিনে একবার সেই বিন্দুটি প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেন একখানা বড় চাকা পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে ঘুরিতেছে, ও আর একখানা ছোট চাকা সেই বড় চাকারই পরিধিস্থিত একটি বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আটাশী দিনে

অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। বুধগ্রহ যেন এই ছোট চাকার পরিধির উপর অবস্থিত। অথবা, আজ কাল আমরা যেমন মনে করি, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর পৃথিবী চন্দ্রকে লইয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, কতকটা সেইরূপ। সুতরাং আজ বুধগ্রহ অমুক স্থানে আছে বলিয়া দিলে দশ দিন পরে কোথায় থাকিবে, গণনা বড়ই সহজ হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে স্থির কর, সেই বিন্দুটি দশ দিনে কত দূর যাইবে। এক বৎসরে যদি যায় ৩৬০ ডিগ্রি, দশ দিনে যাবে কত ডিগ্রি, এইরূপ হিসাব। তার পর, বুধগ্রহ দশ দিনে বিন্দুর পার্শ্বে কতটুকু ঘুরিবে স্থির কর। ৮৮ দিনে ঘুরে সমগ্র এক পাক, দশ দিনে ঘুরিবে কতটুকু। প্রথমে পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া বিন্দুটিকে দশ দিনের রাস্তা সরাইয়া দাও, পরে বিন্দুটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া বুধগ্রহকে দশ দিনের মত একটুকু ঘুরাইয়া দাও। এইরূপে দশদিন পরে বুধের স্থান পাওয়া গেল।

এইরূপে অন্য অন্য গ্রহেরও স্থাননির্দ্দেশ চলে। মনে কর বৃহস্পতি। বৃহস্পতি প্রায় ৪৩৩৩ দিনে অর্থাৎ কিছু কম বার বৎসরে, একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরে। কিন্তু সেই বিন্দুটি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ৩৬৫ দিনে নক্ষত্রচক্রে ঘুরিয়া থাকে।

ফলে গ্রহমাত্রই এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিধারে নির্দ্দিষ্ট কালে কেহ দ্রুতগতিতে অল্পকালে, কেহ মন্দগতিতে অধিক কালে, (বুধ আটাশী দিনে, ও বৃহস্পতি প্রায় বার বৎসরে) ঘুরিতেছে; আর সেই বিন্দুগুলি যেন সূর্য্যে কোন রকমে সংলগ্ন থাকিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক্ এক বৎসরে নক্ষত্রচক্রে পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ হিসাব করিলে গণনাও সহজ হয়, এবং গণিত ফলও প্রত্যক্ষের সহিত বেশ মিলে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এইরূপ প্রণালীতে গ্রহস্ফুট গণনা হইত,

এবং এখনও দৈবজ্ঞ মহোদয়েরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিকারচিত্তে এইরূপ প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপে টলেমি* এই প্রণালীতে গণনার উদ্ভাবনা করেন। এবং এই উদ্ভাবনাই জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে বিজ্ঞানপদে উন্নীত করে, এবং উদ্ভাবককেও যশস্বী করে।

গ্রহমাত্রই স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্টকালে এক একটি বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সেই বিন্দুগুলি যেন সূর্য্যে কোনরূপে বাঁধা আছে বা সংলগ্ন আছে; তাই সূর্য্য ঘুরিবার সময় তাহাদিগকেও টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এইখানে কল্পনাকে একটু জাগাইয়া যদি মনে করা যায়, বিন্দুগুলি সূর্য্যে আবদ্ধ থাকার দরকার কি, সূর্য্যকেই সেই বিন্দুর স্থানগত মনে কর না; তাহা হইলে কি দাঁড়ায়? না, গ্রহগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য-কেই কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সূর্য্য তাহাদিগের সকলকে লইয়া পৃথিবীকে কেন্দ্রগত করিয়া নক্ষত্রচক্রে ঘুরিতেছে। আর একটা কথা। সূর্য্য পৃথিবীকে পূর্ব্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিলেও যে ফল, পৃথিবী সূর্য্যকে পূর্ব্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিলেও সেই ফল। অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহ যেমন, পৃথিবীও তেমনি, নির্দ্দিষ্টকালে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। অর্থাৎ কি না, সূর্য্যই স্থির, আর পৃথিবীটাও একটি গ্রহ। ইহার উপর প্রতিদিন এক পাক করিয়া আর্য্যভট্টের কথামত পৃথিবীর অবয়বটা ঘুরাইয়া দিলেই আর কিছু বাকী থাকেনা। যাহা জটিল ছিল, তাহা সরল হয়; যাহা দুর্ব্বোধ্য ছিল, তাহা সুবোধ্য হয়; যাহা আঁধার ছিল তাহা আলো হয়। কেবল এই কল্পনাটার উদ্বোধনের দরকার; কেবল

---

* প্রকৃতপক্ষে এই প্রণালী কত প্রাচীন নির্ণয় করা দুষ্কর। টলেমি ইহা সংস্কৃত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেনমাত্র।

একটা লাফের দরকার। সে কালের লোকে কোন গতিকে এই লাফটা দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। কোপর্নিকস এই লাফ দিয়াছিলেন; তাই কোপর্নিকসের জয়।

প্রাচীন মতে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইহারা তিনটি সূর্য্যসংলগ্ন বিন্দু প্রদক্ষিণ করিতেছে; এই বিন্দু তিনটির নাম বৃহস্পতি-শীঘ্র ও শুক্র-শীঘ্র ও শনি-শীঘ্র। এখন আমরা দেখিতেছি, ইহারা তিনটি পৃথক্ বিন্দু নহে; ইহারা সূর্য্য স্বয়ং। বুধ ও শুক্র যে দুই বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের নাম বুধমধ্য ও শুক্রমধ্য। এখন দেখা যাইতেছে, ইহারাও আর কিছু নহে; সূর্য্য স্বয়ং। নামকরণকালে একপক্ষে শীঘ্র ও অন্যপক্ষে মধ্য কেন হইল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

এই বৃহস্পতিশীঘ্রাদি এবং বুধমধ্যাদির ভ্রমণ ব্যতীত গ্রহদের নিজের সেই সেই বিন্দুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, আমরা হাল হিসাবে তাহা সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেকালে নির্দ্ধারিত গ্রহগণের কেন্দ্রপ্রদক্ষিণ (অর্থাৎ সূর্য্যপ্রদক্ষিণ) কালের সহিত অধুনাতন কালে নানাবিধ যন্ত্রাদিযোগে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালের তুলনার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। পাঠকগণ সেকালের ও একালের পর্য্যবেক্ষণ তুলনা করিবেন।

গ্রহ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুযায়ী ভগণকাল			পাশ্চাত্যমতে ভগণকাল		
	দিন	দণ্ড	পল	দিন	দণ্ড	পল
বুধ	৮৭	৫৮	১০	৮৭	৫৮	৯
শুক্র	২২৪	৪১	৫৫	২২৪	৪২	২
পৃথিবী	৩৬৫	১৫	৩২	৩৬৫	১৫	২২

মঙ্গল	৬৮৬	৫৯	৫১	৬৮৬	৫৮	৪৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২	১৯	১৪	৪৩৩২	৩৫	৫
শনি	১০৭৬৫	৪৬	২	১০৭৫৯	১৩	১০

ফলিত জ্যোতিষের আচার্য্য মহাশয়গণ বাহুযুদ্ধে আহ্বান করিবেন, এরূপ আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকিলেও এ প্রস্তাবে আমরা বলিতে পারি যে, অন্যান্য গ্রহের গতির সহিত আমাদের তত সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীর গতির, অথবা প্রাচীন কালের হিসাবে সূর্য্যের গতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই গতির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সূর্য্য নক্ষত্রচক্রে পূর্ব্বমুখে খানিকটা করিয়া হঠিয়া যায়; কিন্তু এই গতির বেগ সংবৎসর প্রায় সমান থাকিলেও ঠিক্ সমান থাকেনা। সূর্য্য কখন একটু দ্রুত, কখন একটু ধীরে চলে। বার মাস সমান বেগে চলিলে গণনায় কোন গোলযোগ ঘটিতনা। কিন্তু কখন একটু ধীরে, কখনবা একটু দ্রুত চলায় গণনায় জটিলতা আইসে।

এই ব্যতিক্রম দুই কারণে ঘটে। প্রথম সূর্য্যের পথ ঠিক্ নিরক্ষ-বৃত্তের সহিত এক সমতলে বর্ত্তমান নাই। অর্থাৎ সূর্য্য সংবৎসর কাল নিরক্ষবৃত্তের উপরে থাকেনা। একটু পাশ কাটিয়া কখন একটু উত্তরে আসে, কখন বা একটু দক্ষিণে যায়; বৎসরে দুইবারমাত্র ঠিক্ নিরক্ষবৃত্তের উপরে আইসে। একবার চৈত্র মাসে, একবার আশ্বিনে। চৈত্রের পর ক্রমে উত্তরে গিয়া ২৩॥০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর-গামী হয়; আশ্বিনের পর ক্রমে দক্ষিণে গিয়া ক্রমে ২৩॥০ অংশ পর্য্যন্ত দক্ষিণগামী হয়। জ্যোতিষের ভাষায় বলিতে গেলে, রবিমার্গ পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তকে ২৩॥০ অংশ (সূক্ষ্ম হিসাবে ২৩ অংশ ২৮ মিনিট) কোণ

রাখিয়া দুই জায়গায় ছেদ করিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষে ২৩॥০ অংশকে ২৪ অংশ ধরা রীতি আছে। নিরক্ষবৃত্ত ও রবিমার্গের মধ্যগত কোণকে ক্রান্তি বলে। অতি প্রাচীন কালে এই ২৪ অংশ ক্রান্তি নির্ণীত হইয়াছিল। এই যে আধ অংশ ভুল এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহা বোধ করি কখনও সংশোধিত হয় নাই। এই ক্রান্তির পরিমাণ আবার চিরকাল ঠিক্ সমান থাকেনা।* কোন্ সময়ে ক্রান্তির পরিমাণ ২৪ অংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল না জানিলে কতটুকু পর্য্যবেক্ষণের দোষে, আর কতটুকু স্বাভাবিক ক্রান্তিহ্রাসের কারণে, এই আধ অংশ তফাত দাঁড়াইয়াছে, বলা দুর্ঘট হইয়া পড়ে।

বলা বাহুল্য সূর্য্যের এই উত্তরদক্ষিণমুখ গতির কারণে, অর্থাৎ এই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বশে ঋতুপরিবর্ত্তন ও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু হইতে ২৩॥০ অংশ দূরস্থ দেশ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এমন ঘটে, যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যের অস্তই হয়না, অথবা সূর্য্যের উদয়ই হয়না। কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে দিবারাত্রির পরিমাণ কত হইবে, তাহা সেকালে ত্রিকোণমিতি প্রয়োগে নিরূপিত হইত। মেরুস্থলে ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি, কেবল আমরাই জানি, আর প্রাচীনেরা জানিতেননা, এরূপ নহে।

সূর্য্যের গতির অনিয়মের আর একটি কারণ আছে। সূর্য্যের পথ (আজ কাল বলিব, পৃথিবীর পথ) ঠিক বৃত্তাকার নহে। কেপলার প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, এই পথ বৃত্তাভাস ক্ষেত্রাকার। বৃত্তাভাসের ইংরাজি নাম ellipse। পথের আকার এইরূপ হওয়ায় সূর্য্য সংবৎসর

*৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই বক্রতা ২৪ অংশের কাছাকাছি ছিল। আরও কয়েক বৎসর পরে ইহা প্রায় ২৩ অংশে দাঁড়াইবে। শুনা যায় প্রাচীন মিসরের ও কালদিয়া দেশের লোক এই ক্রান্তিহ্রাস আবিষ্কার করিয়াছিল।

ব্যাপিয়া পৃথিবী হইতে সমান দূরে থাকেনা ; কখন একটু বেশী দূরে থাকে ও ধীরে চলে ; কখন একটু কম দূরে থাকে ও দ্রুত চলে। সম্প্রতি পৌষের মাঝামাঝি অন্য সময়ের চেয়ে নিকটে থাকে ও আষাঢ়ের মাঝামাঝি অন্য সময় হইতে দূরে থাকে। এই কারণে শীতকালে সূর্য্য দ্রুত চলে ও গ্রীষ্মকালে সূর্য্য ধীরে চলে, এবং এই কারণেই বৎসরের মধ্যে শীতার্দ্ধটা এখন ছোট, ও গ্রীষ্মার্দ্ধটা এখন বড়।

এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বোধ হইবে, ইংরাজি মতে পঞ্জিকা গণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা সমধিক যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসঙ্গত। প্রথম কথা, বৎসরে প্রায় ৩৬৫।০ দিন, কিন্তু বাধ্য হইয়া সকলকেই ৩৬৫ দিনে ব্যাবহারিক বৎসর ধরিতে হয়। এজন্য যে ভুল ঘটে, ইংরেজি পঞ্জিকায় তাহার চারি বৎসর অন্তর একদিন যোগ করিয়া সংশোধিত হইয়া থাকে। আমাদের পঞ্জিকায় বৎসর বৎসর সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবহার আছে। দ্বিতীয় কথা, ইংরাজি বারমাসের দিনসংখ্যার যে আঁটাআঁটি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ব্যবহারে কিছু সুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে যুক্তি কিছুই নাই। আমাদের পঞ্জিকামতে মাসের দিনসংখ্যা ঠিক্ সূর্য্যের গতির বেগানুসারে নির্দ্ধারিত হয়। গ্রীষ্মকালে মাসগুলা বড় হয়, কেননা সূর্য্য তখন ধীরে চলে ; শীতকালে ছোট হয়, কেননা সূর্য্য তখন দ্রুত চলে। এই জন্যই সূর্য্যের উত্তরদেশভ্রমণে (১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ১৮৭ দিন, এবং দক্ষিণভ্রমণে (১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত) ১৭৮ দিনমাত্র অতিবাহিত হয়।

সূর্য্যের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস, এবং পৃথিবী ঠিক্ সেই পথের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নহে, একটু পাশ চাপিয়া রহিয়াছে।

এই জন্যই উল্লিখিত গোলযোগ। সে কালে সূর্য্যের পথ ঠিক্ বৃত্তাভাস বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বৃত্তাভাসের তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সূর্য্যের এই অনিয়ত গতিগণনার জন্য একটু কারিকরির দরকার হইত। দুইটা বিন্দু খুব কাছাকাছি গ্রহণ করিয়া সেই বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া ঠিক্ সমান দুইটি বৃত্ত টান। একটি বৃত্তের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত, এবং সূর্য্য দ্বিতীয় বৃত্তে সমান বেগে ভ্রমণশীল, এইরূপ ধরিয়া লইলে, সূর্য্যের বেগ কখন একটু অধিক, কখনও বা একটু কম বলিয়া আমাদের কেন বোধ হয় বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীকেন্দ্রক বৃত্তটিকে প্রতিবৃত্ত বলা যায়। উভয় বৃত্তের কেন্দ্র দুইটির দূরত্ব যদি অধিক না হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিবৃত্তে ভ্রমণ আর বৃত্তাভাস ক্রমে ভ্রমণ, উভয়ে বেশী তফাত দাঁড়ায়না।

এইরূপ প্রতিবৃত্তের কল্পনা করিয়া যে প্রণালীতে সূর্য্যের অবস্থিতি গণনা হইত, সেই প্রণালী আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও বর্ত্তমান আছে। তাহার মৌলিক পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। প্রণালীটির বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভবেনা। গণনার জন্য প্রতিপদে ত্রিকোণমিতির সাহায্য আবশ্যক; এবং উপরে বলিয়াছি, এই কার্য্যসাধনের জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সূর্য্যের গতির সম্বন্ধে আর একটি কথা। রবিমার্গ ঠিক্ বৃত্তাকার নহে, অর্থাৎ পৃথিবী সকল সময়ে সূর্য্য হইতে সমান দূরে থাকেনা। রবিমার্গ যে দুই স্থলে ১০ই চৈত্র তারিখে এবং ১০ই আশ্বিন তারিখে বিষুবরেখাকে ছেদ করে, সেই দুই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। এই ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয় আকাশে একত্র স্থির নহে; ক্রান্তিপাত দুইটা ক্রমশঃ পশ্চিমে একটু একটু সরিয়া যাইতেছে। ইহাদের গতি এত ধীর, যে বহুকালব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত এই গতি ধরা পড়েনা। বাস্তবিকই

সৌরজগতের অন্যান্যগতির তুলনায় এই গতি একরকম আধুনিক কালেই ধরা পড়িয়াছে বলিতে হইবে। ক্রান্তিপাত বৎসর কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা হিসাবে পশ্চিমে যায়। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশহাজার বৎসরে সমুদয় চক্রটা ঘুরিয়া আইসে। সূর্য্য দ্রুত চলে পূর্ব্বমুখে, আর ক্রান্তিপাত ধীরে চলে পশ্চিমমুখে। ফলে এই দাঁড়ায়, সূর্য্য ক্রান্তিপাত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া পূরাপূরি এক পাক ঘুরিয়া আসিবার একটু পূর্ব্বেই ক্রান্তিপাতকে আবার দেখিতে ও ধরিতে পায়। ক্রান্তি-পাতের এই গতিটুকু না থাকিলে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত স্বস্থানে স্থির থাকিলে, সূর্য্য সংবৎসরে পূরা একপাক ঘুরিয়া ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইত। আমরা সূর্য্যের পূরাপূরি একপাক ঘুরিবার সময়কে এক বৎসর ধরি। ইংরাজেরা সূর্য্যের ক্রান্তিপাত হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে উপস্থিতির সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর ধরে। সেই জন্য আমাদের পঞ্জিকার বৎসরের চেয়ে ইংরাজি পঞ্জিকার বৎসর একটুকু ছোট। ইহাতে দোষ বা ভুল কোন পক্ষেরই নাই। তবে আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকাগণনা যখন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সূর্য্য বৎসরারম্ভে পয়লা বৈশাখ তারিখেই ক্রান্তিপাতে ছিল; এই কয়েক শত বৎসরে ক্রান্তিপাত এতটা সরিয়া গিয়াছে, যে এক্ষণে পয়লা বৈশাখের প্রায় বিশ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০ই চৈত্র তারিখে, সূর্য্য ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়। আগে পয়লা বৈশাখ দিবারাত্রি সমান হইত; এখন ক্রমে পিছাইতে পিছাইতে ১০ই চৈত্র দিবারাত্রি সমান হইতেছে। আমরা যদি এই বড় বৎসরই অবলম্বন করিয়া থাকি, ইংরাজদের মত ছোট বৎসর না লই, তবে কালে পৌষ মাসে দিবারাত্রি সমান হইবে, ও মাঘে বৈশাখী গ্রীষ্মের অনুভব ঘটিবে। প্রাচীন জ্যোতিষে এই ক্রান্তিপাতের গতির নাম অয়নচলন। অয়নচলন এদেশে অতি প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত

হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা; আমাদের পঞ্জিকার ৫৫ বিকলা ধরে। ৫ বিকলার তফাত; সামান্য বটে; আবার সামান্য নহেও।

কিন্তু এই অয়নচলন গতিসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের একটি বড় বিষম ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল। এখন আমরা নিঃসংশয়ে জানি, যে ক্রান্তিপাত প্রতিবর্ষে একটু চলিয়া প্রায় ২৫০০০ বৎসরে একচক্র ঘুরিয়া আসে। সেকালের পণ্ডিতদের অধিকাংশের ধারণা ছিল, ক্রান্তিপাতের গতি যেন পেণ্ডুলমের মত। পশ্চিমে চলিতে চলিতে কিয়দ্দূর চলিয়া, (কাহারও মতে ২৭ অংশ, কাহারও মতে ২৪ অংশ মাত্র চলিয়া) পূর্ব্বমুখে ফিরে; আবার পূর্ব্বে সেই পর্য্যন্ত যাইয়া আবার পশ্চিমে ফিরে। একটি স্থির বিন্দুর পশ্চিমে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) ও পূর্ব্বে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) এই প্রদেশটুকুমধ্যেই ক্রান্তিপাত পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে; একবারে একই মুখে চলিয়া একচক্র ঘুরেনা; ভাস্করাচার্য্য ও আরও দুই এক জন এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ক্রান্তিপাতের চক্রভ্রমণই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক্, তাহা নির্ণয়ের জন্য বহু শতাব্দের পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য উপায় বর্ত্তমান ছিলনা। নিউটনের পর মীমাংসার অন্য উপায় হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকায় আজ পর্য্যন্ত সেই ভ্রমাত্মক মত গৃহীত হইয়া আসিতেছে; ইহার সংশোধন না হইলে কালে বড়ই বিভ্রাট ঘটিবে। দেড়শ দুইশ বৎসর পূর্ব্বেও জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া গণনাপ্রণালী সংশোধনে সাহসী হইতেন। আজ কাল আমাদের ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত শামলা-উপলক্ষিত ডিগ্রিপুঞ্জ সে সাহস ও সে ভরসা দেয়না। হায় সে কাল!

অনেকের হয়ত ধারণা আছে, ধ্রুবতারা চিরকালই ধ্রুবতারা আছে।

বস্তুতঃ তাহা নহে। অয়নচলনের হেতু ধ্রুবতারা কিছুদিন পূর্ব্বে ধ্রুব-তারা ছিলনা; সুমেরু হইতে দূরবর্ত্তী ছিল; এবং বহুদিন সে ধ্রুবতারা রহিবেনা; সুমেরু হইতে অনেক দূরে যাইবে।

মৃত্যু।

লেজটা কোনরূপে লুপ্ত হইলে বানর বনমানুষে দাঁড়ায়, এবং বনমানুষ একটুকু চিকণ হইলে মানুষ হইতে তাহার বড় তফাত থাকেনা। উক্ত তিনটি জীবকে পাশাপাশি দাঁড় করাইলেই এইরূপ সংশয় আসিয়া পড়ে, এবং কালক্রমে কোনরূপে বানর লেজহীন হইয়া বনমানুষে ও বনমানুষ চিক্কণ হইয়া মানুষে দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে অধিক মস্তিষ্ক খরচের দরকার হয়না। আবার কুমীরের বাচ্চার ঠোঁটদুটাকে চঞ্চুতে পরিণত করিয়া সামনের দুই পায়ে পালক ঘুড়িয়া দিলে উহা প্রায় পাখীতে পরিণত হয়, প্রাণিতত্ত্ববিদের ইহা বুঝিতে অধিক সময় লাগেনা। কিন্তু এই পরিণতি ব্যাপারটা যে কিরূপে সাধিত হইবে, সেইটা স্থির করাই কঠিন সমস্যা। এই খানেই গণ্ডগোল। ঠিক্ কথা, বানরের লেজ গেলে মানুষ হইবে; কিন্তু লেজ যাবে কিরূপে? কুমীরের বা টিক্‌টিকির সম্মুখের পা দুখানাকে ডানায় পরিণত করিতে পারিলে পাখী হইবে বটে; কিন্তু পা দুখানা ডানায় পরিণত হইবে কিরূপে?

এই 'কিরূপে' প্রশ্নটার উত্তর দিতে সহজে কেহ সাহসী হয়েন নাই। ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ লামার্ক প্রথমে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিবার চেষ্টা করেন। সন্তান মাবাপের শরীরগত ধর্ম্ম লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ঠিক্ সর্ব্বতোভাবে মাবাপের সদৃশ না হইলেও, প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই মাবাপের সদৃশ হয়। কেন না, গরুর পেটে হাতীর ছানার উদ্ভব খবরের কাগজ ভিন্ন অন্য কোথাও এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সুতরাং সন্তানে নিজধর্ম্ম সংক্রমণের ক্ষমতা জীবের প্রধানতম লক্ষণ।

তারপর আর একটা কথা। সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃধর্ম্ম পায়, আবার নিজে কিছু নূতন ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। দেশগুণে, তাহার প্রকৃতি অনেকটা নূতন ভাবে আক্রান্ত হয়; ফলে জন্মকালে সে যেমনটি ছিল, বয়সকালে ঠিক্ তেমনটি থাকেনা। কতকটা পৃথক্ ভাবের জীব হইয়া পড়ে। মাবাপ হইতে বড় বেশী তফাত হয়না; তবে কতকটা তফাত হয়। তাহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত উভয়বিধ প্রকৃতিই আবার তাহার নিজ সন্তানে সংক্রমণ করে; কাজেই তাহার সন্তান আর সর্ব্বাংশে পিতৃপিতামহের সমান থাকেনা। এইরূপে পুরুষানুক্রমে একটু একটু তফাত দাঁড়াইয়া বহু পুরুষ অতীত হইলে, এতটা পার্থক্য দাঁড়ায় যে, তখন পরপুরুষ ও প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ উভয়কে একশ্রেণীস্থ জীব বলিয়া চিনিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। মনে কর, কোন জীবের জীবন বৃত্তি এইরূপ যে, তাহাকে একটা বিশেষ অঙ্গের সর্ব্বদা চালনা করিতে হয়; অভ্যাস ও চালনাবশে তাহার সেই অঙ্গটা বিশেষ পুষ্টি ও সামর্থ্য লাভ করে। তাহার সন্তানে সেই পুষ্টি ও সামর্থ্য সংক্রামিত হয়। সেই সন্তান আবার সেই অঙ্গকে আরও পুষ্ট ও সমর্থ করিয়া নিজ সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত করে। এইরূপে কয়েক পুরুষে সেই বিশেষ অঙ্গটা এতখানি পুষ্টিলাভ করে যে, মাঝের কয়েক পুরুষের ধারাবাহিক ইতিহাস না জানিলে, এ যে উহা হইতে এইরূপে জন্মিয়াছে, ইহা স্থির করা দুঃসাধ্য হয়। যেমন অঙ্গবিশেষের চালনা দ্বারা ক্রমে তাহার পুষ্টি ঘটিতে পারে, সেইরূপ আবার বৃত্তিভেদ ও ব্যবসায়ভেদ অনুসারে উহার ব্যবহার ও চালনার অভাবে, কালক্রমে সেই অঙ্গের ক্ষয় ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে ক্ষয় ও হ্রাস ও খর্ব্বতা ঘটিয়া অঙ্গটা একবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নহে।

বলা বাহুল্য, লামার্ক, জীবের অভিব্যক্তির এই যে ধারা নির্দ্দেশ

করিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিতসমাজ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসে জিরেফার গলা লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, এবং পুরুষানুক্রমিক অনভ্যাসে উট পক্ষীর উড়িবার শক্তি লোপ পাইয়াছে এরূপ স্বীকার কথঞ্চিৎ চলিতে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র এই অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফলে নির্ভর করিয়া বানরকে নরে ও টিকটিকিকে পাখীতে পরিণত করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র।

লামার্কের পর ডারুইন। জীবের ক্রমবিকাশবিধানে অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল ডারুইন স্বীকার করিতেননা, এমন নহে; তবে তিনি ইহাকে অভিব্যক্তির মুখ্য কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ডারুইনের মতে অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইয়া, স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম ও স্বোপার্জ্জিত শক্তি পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া, জীবের ক্রমবিকাশে কতকটা সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার পরিমাণ একেবারে অকিঞ্চিৎকর না হইলেও, যৎসামান্য মাত্র। ডারুইনের মতে জীবের অভিব্যক্তির প্রধান কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে যৌন নির্ব্বাচনাদি আরও পাঁচটা কারণ অল্প বা অধিক মাত্রায় অভিব্যক্তিসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের তুলনায় আর সকলগুলাই নগণ্য। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল কথা দুইটি।

প্রথম, জীবের জীবনরক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীতে যত জীব আছে, তত আহার নাই। বোধোদয়ের প্রথম পৃষ্ঠে ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বটে; কিন্তু জীবের সংখ্যাটা গণনা করিলে এবং খাদ্যের পরিমাণটা ওজন করিয়া দেখিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্যে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। এইরূপ গণনা ও ওজন করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ঈশ্বর যত জীবের সৃষ্টি

করিয়াছেন, তাহাদের সকলের উপযোগী আহারের ব্যবস্থা করেন নাই। মুষ্টিমেয় খাদ্য লইয়া সংখ্যাতীত জীবে কাড়াকাড়ি করিয়া মরিতেছে, সংসারের ইহাই প্রকৃত অবস্থা। এই ভয়াবহ নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রামে যাহার কোনরূপ একটা সুবিধা আছে, সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। সেই দৈবলব্ধ সুবিধা, হয়ত দুখানা লম্বা পা অথবা একটু কটা চামড়া কিংবা একটু ধারাল দাঁত অথবা একটু মোটা বুদ্ধি, যে রকমেরই সুবিধা হউক না, জীবনসংগ্রামে তাহার অনুকূল হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাকে জীবনরক্ষায় ও আহারলাভে সমর্থ করে। জীবনসংগ্রাম এত কঠোর, এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহার ফল এত অনিশ্চিত, যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সুবিধাগুলি জীবনসংগ্রামে অমূল্য অস্ত্রের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় কথা এই। মাবাপের ছেলে মাবাপের মতন হয়, কিন্তু ঠিক্ তেমনটি হয়না; একটু নূতনত্ব, একটু বিশেষত্ব কোথা হইতে লইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার পাঁচটা ছেলে পাঁচ মতন হয়, সর্ব্বাংশে একরূপ হয়না। কেন হয়না, সে কথা বিস্তারের প্রয়োজন নাই। হয়না, ইহা নিশ্চিত। কারও বা গায়ের রঙ্ একটু কালো, কারও বা একটু ফরসা; কারও বা লোমগুলা লম্বা, কারও বা খাট ইত্যাদি। এই সকল নূতন লক্ষণ সন্তানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার এই লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি জীবনের অনুকূল; কতকগুলি জীবনের প্রতিকূল। যাহারা অনুকূল লক্ষণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, মোটের উপর কঠোর জীবনযুদ্ধে তাহারাই জিতে; আর যাহারা প্রতিকূল লক্ষণ লইয়া জন্মে, মোটের উপর তাহারা সন্তানসন্ততি রাখিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধরাধাম হইতেই অবসর গ্রহণ করে।

মোটের উপর যাহারা সুলক্ষণে সৌভাগ্যশালী, তাহারাই বংশ রাখে,

এবং সেই বংশীয়দের মধ্যেও আবার যাহাদের মধ্যে সেই বিশেষ সুলক্ষণটা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারাই টিকিয়া যায়। এইরূপে পুরুষানুক্রমে একটা বিশেষ লক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া একটা বংশকে আর একটা বংশ হইতে পৃথক্ করিয়া তোলে; নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি করে। প্রকৃতি যেন স্বহস্তে তাঁহার অসংখ্য সন্ততিগণের মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া লইতেছেন। ইহারই নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনের ফলে বিশেষ বিশেষ নূতন নূতন লক্ষণাক্রান্ত জীব ক্রমে ধরাতলে প্রকাশ পাইতেছে। জীবের এই ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে কোন্ লক্ষণের বিকাশ হয়? না, যে যে লক্ষণ কোন না কোন প্রকারে জীবনরক্ষায় তাহার অনুকূল। এই প্রশ্নের এই একমাত্র উত্তর।

বলা বাহুল্য ডারুইনের প্রদর্শিত এই অভিব্যক্তির বিধান সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে। জীবনসংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই যে বিবিধ জীবের অভিব্যক্তির একমাত্র না হইলেও প্রধানতম কারণ তাহা স্বীকার করিতে কেহই বড় ইতস্ততঃ করেননা।

লামার্ক ও ডারুইন উভয়ের প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তিবিধানে এক বিষয়ে মিল ও এক বিষয়ে তফাত দেখা যাইতেছে। পিতার ধর্ম্ম পুত্রে বর্ত্তে, উভয়েই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; এবং এই পৈতৃক ধর্ম্মে অধিকার লাভ জীবমাত্রেরই স্বভাবসঙ্গত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেননা। এই বিষয়ে লামার্ক ও ডারুইন একমত। পুত্র তাহার পিতার নিকট হইতে কতক গুলি গুণ স্বভাবধর্ম্মে পায় এবং নিজ আয়াস শিক্ষা ব্যবসায় ইত্যাদির ফলে, মোটের উপর তাহার সমগ্র জীবনের উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব বলে, যে নূতন গুণগুলি অর্জ্জন করে, তাহাও তাহার নিজ পুত্রাদিতে সংক্রান্ত করিয়া যায়; সেই পুত্র আবার পৈতৃক গুণের উপর স্বোপার্জ্জিত

গুণ চাপাইয়া নিজ সন্ততিদিগকে দিয়া যায়। ইহাই লামার্কের মত। ডারুইনের মত অন্যরূপ; তিনি কয়েকটি বেশী কথা বলেন। তাঁহার মতে পুত্রের জন্মকালে তাহার পৈতৃক গুণ ব্যতীত আরও কতকগুলি নূতন গুণ তাহাতে আবির্ভূত হয়। কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহার অন্বেষণে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই। কতকগুলি নূতন চিহ্ন তাহাতে দেখা দেয়, যাহা তাহার পিতৃপিতামহে বর্ত্তমান ছিলনা, ইহা স্বীকার্য্য। এইগুলি যদি দৈবক্রমে তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে জীবনসংগ্রামে বাঁচায় ও কালক্রমে তাহার সন্ততিগণে সংক্রান্ত হয়; আর যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সন্তানোৎপাদনের অবসর দেয়না; তৎপূর্ব্বেই তাহাকে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। কাজেই সেই দৈবলব্ধ জীবনসংগ্রামে অনুকূল লক্ষণগুলি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত ও সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টি ও বিকাশ লাভ করে। বংশের মধ্যে যাহারা সেই সেই লক্ষণ পায়, তাহারাই বাঁচে; যাহারা পায়না, তাহারা বাঁচেনা। ক্রমে জীবনরক্ষার অনুকূল লক্ষণগুলি বংশমধ্যে পুরুষানুক্রমে বিকশিত হইয়া জীবকে ক্রমশঃ উন্নত ও অভিব্যক্ত করিয়া তুলে।

এই শেষ কথাটা ডারুইনের পূর্ব্বে আর কাহারও মাথায় আসে নাই। ডারুইনের ইহাই গৌরব। এবং লামার্কের সহিত ডারুইনের এই খানেই প্রভেদ।

প্রভেদ এতকাল এই পর্য্যন্তই ছিল। সম্প্রতি প্রভেদের মাত্রা সহসা আরও খানিক বাড়িয়া গিয়াছে। জীবশরীরে বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাও পরপুরুষে সংক্রমণ করিতে পারে, লামার্কের এই মত ডারুইন একবারে অস্বীকার করিতেননা। কিন্তু সম্প্রতি ডারুইনের এক সম্প্রদায় শিষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে. তাঁহারা এই ব্যাপারটা একবারেই উড়াইয়া দেন।

হাতুড়ি পিটিয়া কামারের ও লাঙ্গল ধরিয়া চাষার হস্তের পেশীগুলা মোটা ও শক্ত হয়, এবং কামারের ছেলে ও চাষার ছেলে এই পেশীর সবলতা উত্তরাধিকারসূত্রে জন্মকালেই প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বসাধারণেরই সংস্কার এইরূপ। সর্ব্বসাধারণের এই সংস্কারটাকেই লামার্ক তৎপ্রণীত অভিব্যক্তিতত্ত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেনমাত্র। কিন্তু ডারুইনের নূতন শিষ্যেরা বলিতে চাহেন যে, সাধারণের এই সংস্কার কুসংস্কার অথবা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও অমূলক সংস্কার।

ফলে, ডারুইনের এই শিষ্যসম্প্রদায় ডারুইনেরও উপর উঠিয়াছেন। ডারুইন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে অভিব্যক্তির কারণসকলের মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছিলেনমাত্র; ইঁহারা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতির প্রভাবে জীবকর্তৃক নবোপার্জ্জিত ধর্ম্মের পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রমণক্ষমতা ডারুইন অস্বীকার করিতেননা; ইঁহারা তাহা একবারে অস্বীকার করেন। এই উপার্জ্জিত ধর্ম্ম পরপুরুষে সংক্রান্ত হইতে পারে কি না, ইহা পরীক্ষা ও প্রমাণের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতে পারে; অন্যবিধ যুক্তি ইহার প্রতিপাদনে অসমর্থ। উভয় পক্ষে বিস্তর প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে; এবং হাওয়ার গতি যেরূপ, তাহাতে অনুমান হয় যে, নবোত্থিত ডারুইন-শিষ্যেরাই বোধ করি জয়লাভ করিবেন। মানবসাধারণের একটা চিরন্তন বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে বোধ হয় এতদিনে কুঠারাঘাত পড়িল।

এই নূতন সম্প্রদায়ের মত কতকটা এইরূপ। জীব পিতৃপিতামহ হইতে আগত কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যতীত আরও কতিপয় নূতন ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ, নিজ স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ করে। এই ধর্ম্মগুলিকে তাহার সহজাত বা সহজ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পরে উত্তরকালে তাহার জীবনে নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তি

আধিপত্য করিয়া, তাহার শরীরকে ও অন্তঃকরণকে বিবিধরূপে পরিবর্ত্তিত, মার্জ্জিত, সংস্কৃত বা বিকৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে সে জন্মের পর মরণকাল পর্য্যন্ত আর এক শ্রেণীর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। পৈতৃক ধর্ম্ম ও পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র সহজ ধর্ম্ম ছাড়া এই যে তৃতীয় শ্রেণীর ধর্ম্ম জীব স্বয়ং উপার্জ্জন করে, তাহাকে অর্জ্জিত ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। লামার্কের মতে পৈতৃক, সহজ ও অর্জ্জিত, ত্রিবিধ ধর্ম্মই পরপুরুষে সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে বংশমধ্যে প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি লাভ করে। ডারুইনের নূতন শিষ্যদের মতে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মগুলিই, অর্থাৎ পৈতৃক ও সহজ ধর্ম্মগুলিই পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অর্জ্জিত ধর্ম্মগুলি এক পুরুষ ছাড়িয়া পুরুষান্তরে যায়, ইহার প্রমাণাভাব; যে পুরুষে অর্জ্জিত, সেই পুরুষের সহিতই তাহাদের শেষ। অর্জ্জিত ধর্ম্ম পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরপুরুষে যায়না; সুতরাং যাহাকে পৈতৃক ধর্ম্ম বলা গেল, তাহাও তাহার পিতার অর্জ্জিত ধর্ম্ম নহে; তাহার পিতা সেই ধর্ম্ম সঙ্গে লইয়া জন্মিয়াছিল; উপার্জ্জন করে নাই। সুতরাং মোটের উপর ধর্ম্মমাত্রই হয় সহজ, নয় অর্জ্জিত। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সহজ ও অর্জ্জিত উভয় শ্রেণীর মধ্যে সহজ ধর্ম্মগুলির উপরই একান্ত নির্ভর করে। ব্যক্তিবিশেষের জীবনরক্ষায় উভয়বিধ ধর্ম্মই সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু বংশরক্ষায় ও জাতিরক্ষায় সহজ ধর্ম্মগুলিরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। কেন না, অর্জ্জিত ধর্ম্ম এক পুরুষের পর পরপুরুষে যায়না; সহজ ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সহজ ধর্ম্মের মধ্যেই কতকগুলিকে বাছিয়া লয়, ক্রমশঃ পুষ্ট ও পরিস্ফুট করে, এবং কতকগুলিকে ক্রমশঃ লুপ্ত করে। সহজ ধর্ম্মগুলির মধ্যে যে গুলি জীবনের অনুকূল, সেই গুলিই ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে; আর যে গুলি জীবনের প্রতিকূল সে গুলি ক্রমশঃ কয়েক

পুরুষে লোপ পায়। মানুষের মধ্যে পাণ্ডিত্য বা সঙ্গীতপটুতা কোন বংশবিশেষে সহজধর্ম্মমধ্যে থাকিলে যদি উহা কোনরূপে জীবনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহা বংশপরম্পরায় পুষ্ট হইতে পারে; আর উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্জ্জিত বিদ্যামাত্র হইলে পরবর্ত্তী পুরুষের ঐ বিদ্যাপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

জর্ম্মন পণ্ডিত বাইসমান এই নূতন সম্প্রদায়ের নেতা। জীবমধ্যে উল্লিখিত সহজধর্ম্মের পুরুষানুক্রমিকতা কেন ঘটে, ও অন্য ধর্ম্মের ঘটেনা, তাহা তিনি এইরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

জীবমধ্যে সাধারণ সন্তানোৎপত্তির প্রণালীটা এইরূপ। জীব জন্মগ্রহণের পর, অর্থাৎ পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জীবত্বলাভের পর, কিছুকাল ধরিয়া বৃদ্ধি পায়; চতুর্দ্দিক্ হইতে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ ও বৃদ্ধিলাভ করে। এই পুষ্টিলাভ ও বৃদ্ধিলাভ ব্যাপার কিছুকাল চলিয়া পরে স্থগিত হয়। জীবমাত্রেরই জীবনে এমন সময় আইসে, যখন সে আর বাড়েনা; তখন তাহার জীবত্ব পরিণত ও পূর্ণ হয়। সাধারণতঃ এই সময় উপস্থিত হইলে, তাহার শরীরের কিয়দংশ স্বশরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হয়। এই ভাগটাকে বীজ বলা যাইতে পারে। বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইলে ক্রমশই আবার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিয়া পুষ্টি ও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ পুরুষপরম্পরায় চলিতে থাকে।

বীজ হইতে উদ্ভূত নূতন পুরুষ পূর্ব্বতন পুরুষের ধর্ম্ম পাইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের সমগ্র শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি যেন সেই কণামাত্র বীজে কোনরূপে নিহিত ও লুক্কায়িত থাকে; কাল পাইয়া ও সুযোগ পাইয়া ক্রমে বাহির হইয়া ফুটিয়া উঠে। সহজেই অনুমান হয়, বীজটুকু পূর্ব্বতন পুরুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র প্রতিনিধিস্বরূপ। পূর্ব্বতন পুরুষের

সমগ্র শরীরে যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলেরই কিছু-না-কিছু অংশ বীজের মধ্যে নিহিত থাকে। কালে তাহা পুষ্ট, ব্যক্ত ও প্রকাশিত হইয়া উঠে।

বাইসমান অন্যরূপ বলিতে চাহেন। বীজের সহিত সমগ্র শরীরের এইরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেননা। জীবশরীরের স্থূলতঃ দুইটা ভাগ। এইরূপ নির্দ্দেশ প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে খাটে। একটা ভাগকে বীজভাগ বলা যাইতে পারে; দ্বিতীয় ভাগকে আবরণভাগ বলা যাইতে পারে। বীজভাগটাই প্রকৃত প্রাণী; উহাই প্রকৃত জীব। প্রকৃতির নিকট উহারই মূল্য। আবরণভাগটার অস্তিত্ব কেবল বীজভাগকে রক্ষা করিবার জন্য; উহাকে আবরণ করিয়া, ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। উহার অস্তিত্বের অন্য অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। নাক মুখ চোক কান, স্নায়ু অস্থি পেশী ত্বক্ শিরা ধমনী, প্রভৃতি লইয়া সাধারণতঃ যেটা জীবের শরীর বা দেহ বলিয়া পরিচিত, সেটা প্রায় সমগ্রই এই আবরণ কার্য্যের জন্য, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বীজভাগকে প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান। এই আবরণভাগ আবার বীজভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। বীজ আপনার আবরণ আপনি প্রস্তুত করিয়া লয়। বীজ আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে; এক ভাগ বীজই থাকে; অপর ভাগ সেই বীজকে বাহ্যপ্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গঠিত ও নির্ম্মিত হয়। আবরণশরীর বীজশরীর হইতে উদ্ভূত হয়; কাজেই বীজের ধর্ম্ম আবরণে বর্ত্তমান। যে যেমন বীজ, তদুৎপন্ন আবরণ তেমনি। গাছের বীজ হইতে গাছের দেহ, মানুষের বীজ হইতে মানুষের দেহ জন্মে। বীজকে রক্ষা করাই আবরণের কাজ। বহিঃস্থ প্রকৃতির সহিত আবরণেরই কারবার। বহিঃস্থ প্রকৃতির যাহা কিছু অত্যাচার উপদ্রব, তাহা আবরণের উপর দিয়াই যায়।

আবরণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবারের ফলে পীড়িত, দলিত, বিকৃত, পরিবর্ত্তিত হয়। বাহ্য প্রকৃতি আবরণকে ভেদ করিয়া বীজের উপর আক্রমণ বা তাহার বিকারসম্পাদন সহজে করিতে পারেনা। বীজ আবরণকে সৃষ্টি করে; কিন্তু আবরণ হইতে বীজ জন্মেনা। বীজ শস্য,আবরণ তাহার খোসামাত্র। আবরণের বিকারে বীজের বিকার হয়না। আবরণের উন্নতিতে বীজের উন্নতি হয়না। জীবনের প্রথম বয়সে বীজ আবরণের সৃষ্টি করে; আবরণ উত্তরকালে বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজে পুষ্ট, বিকৃত বা সংস্কৃত হইয়া বীজকে রক্ষা করে। জীবনে পূর্ণ বয়স উপস্থিত হইলে, বীজ জীবনের প্রধান কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। আপনি আপনাকে ভাগ করে; আপনার খানিকটা ভাগ আপনা হইতে বিচ্যুত করে; এই ভাগটা পৃথক্ হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে; আপনার স্বভাবানুযায়ী নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া আপনার জীবলীলা আরম্ভ করে। এই ব্যাপারের নাম সন্তানোৎপাদন।

বীজভাগ ক ও আবরণভাগ খ। ক ও খ উভয় লইয়া সম্পূর্ণ জীবশরীর। ক' হইতে খ'এর উৎপত্তি। খ'এর উৎপত্তি ক'কে রক্ষা করিবার জন্য; বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ক'কে বিনষ্ট করিতে উদ্যত আছে, তাহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য। খ বাহির হইতে আহার সংগ্রহ করে, আত্মপুষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে ক'কে নিভৃতে সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখে। ক'য়ে যে সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাই জীবের সহজ ধর্ম্ম; খ বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাবে যে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, তাহাই জীবের অর্জ্জিত ধর্ম্ম। খ সহজে বিকৃত হয়; কিন্তু ক সহজে বিকৃত হয়না। খ ক্রমশঃ পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া আপন সামর্থ্যের সীমায় বা পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত

হয়। সেই সময় জীবের পূর্ণ বয়স বা যৌবনকাল। বাহ্য প্রকৃতির সহিত খ'এর যে সংগ্রাম, তাহা চিরকাল চলিতে পায়না। যত দিন খ'এর জয়, তত দিন উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি। সে সময় আইসে, যখন এই বৃদ্ধি ও পুষ্টি স্থগিত হয়। তখন বাহ্য প্রকৃতি খ'এর উপর জয় লাভ করিতে আরম্ভ করে। আবরণ তখন ক্রমে জীর্ণ হইতে থাকে। খ'এর পুষ্টির ও বৃদ্ধির অবস্থা জীবের বাল্য। খ'এর পরিণত অবস্থা জীবের যৌবন। খ'এর জীর্ণতাপ্রাপ্তির অবস্থা জীবের বার্দ্ধক্য। যৌবনে বা বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ক আপন বার্দ্ধক্যোন্মুখ আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায়। তখন আর প্রাচীন বার্দ্ধক্যোন্মুখ জীর্ণ আবরণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিতে পারেনা। প্রাচীন আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে; অথবা আপনারই খানিকটা অংশ বাহির করিয়া দেয়। ক প্রাচীন খ'এর আবরণ হইতে বাহিরে আসিয়া নূতন ঘর পাতিয়া নূতন সংসারযাত্রা আরম্ভ করে। ক, খ হইতে এইরূপে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিরে আসে ও নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সেই নূতন আবরণের নাম যেন গ। পূর্ব্বতন পুরুষে খ যেমন ক হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পুরুষে গ তেমনি সেই ক হইতেই নির্ম্মিত হয়। ক ও খ একত্র যোগে পিতা বা মাতা। জীবতত্ত্বে পিতা ও মাতা উভয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই; উভয়েরই সংসারে স্থান একরূপ; উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য একরূপ। ক ও গ একত্র যোগে পুত্র বা কন্যা। ক ও খ উভয়ের সমষ্টি পূর্ব্বপুরুষ; ক ও গ উভয়ের সমষ্টি পরপুরুষ। সহজ ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান ছিল, তাহা পরপুরুষেও দেখা দেয়। কেন না, সহজ ধর্ম্ম ক'য়ের ধর্ম্ম; এবং পূর্ব্বপুরুষের ক অবিকৃত অবস্থায় পরপুরুষে যায়। পূর্ব্বে ক ছিল এক আবরণের ভিতর; এখন সেই ক আছে অন্য আবরণের ভিতর। পিতা ও পুত্রে এইমাত্র তফাত। পূর্ব্বপুরুষের

অর্জ্জিত ধর্ম্ম পরপুরুষে যায়না ; কেন না, গ’ এর সহিত খ’ এর কোন সম্বন্ধ নাই। বাহ্য প্রকৃতি খ’য়ে যে পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাহা ক’য়ে সংক্রামিত হয়না ; কাজেই তাহা গ’য়ে যায়না। পরপুরুষের ক এবং গ পূর্ব্বপুরুষের সহজ ধর্ম্মমাত্র পায় ; অর্জ্জিত ধর্ম্ম পায়না। তেমনি আবার গ যে সকল নূতন ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহা তৎপরবর্ত্তী পুরুষে যায়না ; আপন জীবনেই তাহার সমাপ্তি হয়।

বীজ ক প্রাচীন জীর্ণ আবরণ খ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন আবরণ গ’কে নির্ম্মাণ করে, ও তাহার মধ্যে আবার যৌবনকাল পর্য্যন্ত বসবাস করে। ক মুক্তি লাভ করিয়া নূতন স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে খ’এর কাজ ফুরাইল। গ’এর কাজ যখন আরম্ভ হইল, খ’এর কাজ তখন শেষ হইল। প্রকৃতির আর তখন খ’এর উপর অণুমাত্র মমতা নাই। পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ। পিতার জীবনের উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহার অস্তিত্ব ধরার ভার-স্বরূপ। তাহার অস্তিত্ব এখন জীবনসংগ্রামের তীব্রতা বাড়ায়মাত্র। শিশু স্ফূর্ত্তি ও আগ্রহ সহকারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উৎসাহে জীবনসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধের জীবন এখন উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক। প্রকৃতি তাহাকে এক পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। সে এখন সেই পন্থায় চলুক। সেখানে সে শান্তিলাভ করিবে। সেই পন্থার নাম মৃত্যুর পন্থা। বৃদ্ধের মরণই মঙ্গল। বৃদ্ধ যেন জীবিত থাকিয়া ভবের বোঝা ভারী না করে।

ক ও খ লইয়া প্রথম পুরুষ ; ক ও গ লইয়া দ্বিতীয় পুরুষ ; ক ও ঘ লইয়া তৃতীয় পুরুষ। এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ চলিয়া জীবনের প্রবাহ বাহিত রাখে। বীজ ক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চলে। আবরণ খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি পুরুষে পুরুষে বদল হয়। খ, গ, ঘ, তিনই ক

হইতে মূলতঃ উৎপন্ন; তাই শৈশবকালে খ, গ, ঘ অনেকটা একভাবাপন্ন থাকে; বয়সের সহিত খ, গ, ঘ, ব্যবসায়ভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিকৃত হইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। খ, গ, ঘ' এর যে সাদৃশ্য, তাহা ক হইতে উৎপন্ন; সহজ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। যে বিভেদ, তাহা বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। পুরুষানুক্রমে সহজ ধর্ম্মের স্রোত চলে; অর্জ্জিত ধর্ম্ম এক পুরুষেই আবদ্ধ থাকে।

যাহা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জীবের আবরণশরীরের যতই বিকার, যতই পরিবর্ত্তন ঘটুক না, উহার বীজশরীরের বিকারসম্ভাবনা বিরল। তবে কি বীজ একবারেই অবিকৃত থাকে? তাহা হইলে ত অভিব্যক্তির দ্বার একবারে রুদ্ধ হয়। ক'এর অর্থাৎ বীজেরও বিকারক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে ক রথী; খ তাহার রথ। ক'কে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। খ'এর সৃষ্টি আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়মাত্র। ক আপনাকে আপনি বিকৃত করিতে পারে। সংগ্রামে যখন যেমন দরকার, তখন স্বয়ং সেইমত পরিবর্ত্তিত হইবার ক্ষমতা রাখে। কোথা হইতে এই ক্ষমতার উৎপত্তি, তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে পার; সে স্বতন্ত্র কথা। যতদিন সেই কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পার, ততদিন উহাই তাহার স্বভাব জানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্ততঃ তাহার ঐরূপ স্বভাব না হইলে জীবনযুদ্ধে সে এতদিন বিলুপ্ত হইত। ঐরূপ স্বভাব আছে, তাই সে আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ক ধীরে ধীরে জীবনসমরের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ, জীবের সহজ ধর্ম্মগুলিও পুরুষপরম্পরায় ঠিক্ সমান ও অবিকৃত না থাকিয়া ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়। যে ভাবে পরিবর্ত্তন হইলে সংগ্রামে ফললাভের সম্ভাবনা, সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। সহজ ধর্ম্মগুলির মধ্যে প্রকৃতির নির্ব্বাচন চলে।

প্রকৃতিই এখানে নির্ব্বাচনপরায়ণা। অনুকূল ধর্ম্মগুলি পুষ্ট হয়; প্রতিকূল ধর্ম্মগুলি লোপ পায়। ক ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাব সহজ ধর্ম্মের উপর। অর্জ্জিত ধর্ম্মের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই।

জীবের ইতিহাসে প্রথম দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত জীবের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বীজের উন্নতির ফলে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই প্রধানতঃ এই বীজের উন্নতির সাধক। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কি উপায়ে অলক্ষিত ভাবে বীজের উন্নতি সাধন করে, বীজ তাহার উন্নতিসাধনক্ষমতা কোথা হইতে পাইয়াছে, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। এখন সে দিক্ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।

জীব নশ্বর কি অনশ্বর, এই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যাহা দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইতেছে, ক অনশ্বর; অর্থাৎ জীবের বীজদেহ অনশ্বর; খ নশ্বর, অর্থাৎ জীবের আবরণদেহ নশ্বর। মৃত্যু বীজের ধর্ম্ম নহে, মৃত্যু আবরণশরীরের ধর্ম্ম। বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহান্তরে যায়; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করে। পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া যায়; জীর্ণ পরিধান কালক্রমে ছিঁড়িয়া যায়। ক মরেনা; খ হইতে গ'য়ে যায়, গ হইতে ঘ'য়ে যায়। কিন্তু খ, গ, ঘ' এর শেষ পরিণতি মৃত্যু। বীজের আকস্মিক মরণ কখন কখন দৈবক্রমে ঘটিতে পারে; আবরণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্,—এইরূপ নির্দ্দেশ তবে এই অর্থে বুঝি সত্য নহে। মৃত্যু জীবের আবরণশরীরের ধর্ম্ম, সুতরাং অর্জ্জিত ধর্ম্ম। বীজে ঐ ধর্ম্ম নিহিত নাই। বীজের আবরণভাগ ঐ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে। কেন? কি উদ্দেশ্যে? জীর্ণ আবরণের জীবনসংগ্রামে কোন উপকারিতা নাই। উহা জীবনের ভার

অয়নচলন ব্যতীত আর একটা গতির উল্লেখ আবশ্যক। ক্রান্তিপাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমমুখে চলে; কিন্তু মন্দোচ্চস্থল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে চলে। সূর্য্যের পথ (অথবা পৃথিবীর পথ) ঠিক্ বৃত্তাকার নহে, সেই জন্য পৃথিবী সর্ব্বদা সূর্য্য হইতে সমান দূরে থাকেনা। যে স্থানে উভয়ের দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই স্থলের নাম মন্দোচ্চ। ইহার ইংরাজি নাম apogee. সূর্য্য কখন একটু বেশী দূরে যায়, কখন একটু নিকটে আসে; সেই জন্য সূর্য্যের মণ্ডল কখন একটু ছোট দেখায়, কখন একটু বড় দেখায়। সংবৎসরের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কখন একটু বড়, কখন একটু ছোট দেখায়। এই ইতর বিশেষ এত সামান্য যে সহজ চোখে ধরা পড়েনা। যন্ত্রযোগে সহজেই ধরা পড়ে। যেমনেই হউক এই ইতরবিশেষটুকু মাপিতে পারিলেই সূর্য্যের ন্যূনতম ও অধিকতম দূরত্বের মধ্যে কত তফাত জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের পথের আকার বৃত্তের আকার হইতে কত তফাত, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কোন্ সময়ে কত বড় দেখায়, অর্থাৎ কোন্ সময়ে আকাশমণ্ডলের কতটুকু জায়গা লইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে পরিমাণের প্রয়োজন। আজ কাল অবশ্য যন্ত্রসহকারে এই পরিমাণ সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালে তেমন সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিলনা; অন্য উপায় অবলম্বিত হইত।

মনে কর, আজ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কত বড় দেখায়; অর্থাৎ সূর্য্যের মণ্ডল আকাশচক্রে কত ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, বাহির করিতে হইবে। প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘড়ী লইয়া খোলা মাঠে অথবা উচু ছাদের উপর বসিয়া থাক। ঠিক্ কোন্ সময়ে সূর্য্যমণ্ডলের এক প্রান্ত, অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্ত, চক্রবাল রেখায় দেখা দিল, স্থির কর। তার পর কতক্ষণ পরে সূর্য্যমণ্ডলের অপর প্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রান্ত, চক্রবালে দেখা

দিল, অর্থাৎ কি না, ঠিক্ সমগ্র মণ্ডলটি উদিত হইল, তাহা স্থির কর। এই সময়টুকু সমগ্র মণ্ডলের উদয়কাল। এই সময়টুকু স্থির হইলেই ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিতে আর বেশী কষ্ট পাইতে হইবেনা। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন হেতু সূর্য্যমণ্ডল প্রায় ৬০ দণ্ডে সমগ্র আকাশ চক্রটা অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি পরিমিত স্থান ঘুরিয়া আসে। ঠিক্ ৬০ দণ্ডে নহে; কোন দিন একটু অধিক সময়ে, কোন দিন একটু অল্প সময়ে। যাহা হউক, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে কতটকু সময় আবশ্যক জানা থাকিলেই, সমগ্র মণ্ডলের উদয়কালে কত ডিগ্রি গতি হইয়াছে জানা যায়। সেইটাই সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাসের পরিমাণ। এই ব্যাসের পরিমাণ প্রায় বত্রিশ কলা, অর্থাৎ আধ ডিগ্রির কিছু অধিক।

আজ কাল সূর্য্যের দূরত্ব ১৮ই আষাঢ় তারিখে অর্থাৎ পূরা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সব চেয়ে অধিক হয়; সেই সময় সূর্য্য মন্দোচ্চে থাকে; তখন সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস প্রায় ৩১৷৷০ কলা পরিমিত দেখায়। আর ১৮ই পৌষ তারিখে অর্থাৎ প্রবল শীতের মাঝামাঝি, সূর্য্যের দূরত্ব সব চেয়ে কম হয়; তখন সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; ব্যাস ৩২৷৷০ কলার একটু অধিক দেখায়।

১৮ই আষাঢ় তারিখে ৩১৷৷০ কলা, আর ছয় মাস পরে ১৮ই পৌষ তারিখে প্রায় ৩২৷৷০ কলা, সংবৎসরে এই এক কলার তফাত। পৃথিবীর পথ ঠিক্ বৃত্তাকার হইলে, আর সূর্য্য তাহার কেন্দ্রবর্ত্তী থাকিলে, এই তফাত টুকু ঘটিতনা। পথ বৃত্তাকার নহে, আর সূর্য্যও ঠিক্ কেন্দ্রবর্ত্তী নাই, একটু এক পাশ ঘেঁষিয়া আছে; সেই জন্য ছয় মাসের মধ্যে এই এক কলার তফাত। ১৮ই পৌষ তারিখে সূর্য্যের দূরত্ব যদি ৬৩ ধরা যায়, ১৮ই আষাঢ় তারিখে দূরত্ব ৬৩ অপেক্ষা কিছু বেশী, প্রায় ৬৫ হইবে। গড় দূরত্ব প্রায় ৬৪; আর সংবৎসরে দূরত্বের ব্যত্যয় প্রায় ২; অর্থাৎ

সমগ্র দূরত্বের বত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এই ভগ্নাংশের ইংরাজি নাম eccentricity. ইহার পরিমাণ জানা থাকিলে সূর্য্যের বেগ বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে কিরূপ হইবে, বাহির করা চলে।

আধুনিক মতে সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণ গড় ৩২ কলা; সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ব্যাসের গড় পরিমাণ ৩২ কলা ২৪ বিকলা; কখন ইহার একটু বেশী, কখনও ইহার একটু কম। সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে eccentricity ধরা আছে, তাহা আধুনিক মতানুযায়ী পরিমাণ হইতে একটু তফাত, একটু অধিক। আধুনিক মতে যাহা ১১৫, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে তাহা ১৩০; অর্থাৎ প্রায় দুই আনা পরিমাণে অধিক। তবে সূক্ষ্ম যন্ত্রের অভাবে এরূপ তফাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

সূর্য্য ১৮ই আষাঢ় তারিখে মন্দোচ্চে থাকে; মন্দোচ্চ হইতে যত দূরে যায়, ততই দূরত্ব একটু একটু কমে, দেখিতেও একটু একটু বড় হয়; সূর্য্যের আকাশচক্রে ভ্রমণের বেগও একটু একটু বাড়ে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে কোন্ তারিখে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কত দূরে আছে, না জানিলে সূর্য্যের গতিগণনা চলেনা। প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রে এইরূপে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কত দূরে আছে, প্রথমে স্থির করিয়া, পরে সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থিতি স্থান নির্দ্ধারিত হইত। আধুনিক জ্যোতিষেও ঠিক্ সেই প্রণালীতে গণনা হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে প্রণালীগত কোন বিভেদ নাই।* কিন্তু এই খানে একটু সাবধান হইতে হয়। সূর্য্যের পথের মন্দোচ্চ স্থান ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। আজ কাল ১৮ই পৌষ তারিখে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থাকে; কিছু দিন পরে আর ঠিক্ ১৮ই পৌষ তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থাকিবেনা; কিছু পরে

*মাধ্যাকর্ষণের নিয়মপ্রয়োগ দ্বারা সৌরজগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগণের গতি আজ কাল যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত নির্দ্ধারিত হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখিনা।

থাকিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ পশ্চিমে সরিতেছে। মন্দোচ্চও তেমনি ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে সরিতেছে। সুতরাং বৎসর বৎসর মন্দোচ্চ কতটুকু করিয়া সরিতেছে, না জানিলে গণনায় চিরকাল ঠিক্ প্রকৃত ফল পাওয়া যাইবেনা। এই মন্দোচ্চের গতি নিরূপণ কিছু কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যখন সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্য না পাওয়া যায়; কেবলমাত্র সূর্য্য মণ্ডলের বিস্তার চোখে দেখিয়া পরিমাণ করিয়া নিরূপণ করিতে হয়। মন্দোচ্চ যে পূর্ব্বমুখে ক্রমশঃ সরিতেছে, তাহা প্রাচীন কালে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু এই গতির পরিমাণ নির্দ্ধারণে বড়ই ভুল ঘটিয়াছিল। প্রাচীন মতে ইহার পরিমাণ সংবৎসরে এক বিকলার প্রায় দশভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ১১।০ বিকলা। এই ভ্রম নিতান্ত কম নহে; এবং এই ভ্রমের দরুণ আমাদের পঞ্জিকার গণনার সহিত দৃষ্ট ফলের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ভ্রান্তিটুকু আমাদের পঞ্জিকায় সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু সংশোধন করিবে কে? সংশোধন গ্রহণ করিতেই বা সাহসী কে?

ক্রান্তিপাতের পশ্চিম মুখে গতি বৎসরে প্রায় ৫০।০ বিকলা; আর মন্দোচ্চের পূর্ব্বমুখে গতি বৎসরে প্রায় ১১।০ বিকলা; উভয় স্থল প্রতি বৎসর প্রায় ৬১।।০ বিকলা হিসাবে পরস্পর হইতে সরিয়া যাইতেছে। এখনি সংবৎসরে শীতার্দ্ধ, গ্রীষ্মার্দ্ধের চেয়ে সাত দিন কম; এই গতি প্রযুক্ত কালক্রমে শীতার্দ্ধ আরও ছোট হইবে। আমাদের পঞ্জিকার মতে মন্দোচ্চের বার্ষিক গতি যৎসামান্য; কিন্তু ক্রান্তিপাতের গতি ৫৪ বিকলা ধরা হয়। সুতরাং মোটের উপর বৎসরে ৭।০ বিকলা ভুল পড়িয়া যাইতেছে। মন্দোচ্চের গতি আমরা প্রকৃত অপেক্ষা কম ধরি, আর ক্রান্তিপাতের গতি প্রকৃতের অপেক্ষা কিছু বেশী ধরি। একটা ভুল আর একটা ভুলকে কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত করিতেছে।

দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কিরূপ ধারণা ছিল জানিতে স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত ঠিক্ রবিমার্গের সহিত এক সমতলে অবস্থিত নাই; পৃথিবী যে অক্ষরেখা বা ধ্রুবরেখার চারিদিকে ঘুরিতেছে, সেই রেখা ঠিক্ পৃথিবীর বার্ষিক ভ্রমণপথের উপর লম্বভাবে দাঁড়াইয়া নাই। পৃথিবীকে যদি একটি লাটি-মের মত ভাবা যায়, এবং তাহার ভ্রমণপথ যদি টেবিলের পৃষ্ঠে রহিয়াছে ধরা যায়, তাহা হইলে যেন লাটিমের শলাকাটি ঠিক্ লম্বভাবে টেবিলের উপর না দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে ঈষৎ হেলিয়া আছে। বড় ঈষৎ নহে; এই অবনতির পরিমাণ প্রায় ২৩॥০ ডিগ্রি, প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে ২৪ ডিগ্রি। এই অবনতি না থাকিলে বারমাসই দিনরাত্রি সমান থাকিত, উহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতনা। এই অবনতির জন্য সূর্য্য ছয়মাস ধরিয়া নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে ও অপর ছয়মাস ধরিয়া নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে থাকে। ১০ই চৈত্র তারিখে নিরক্ষবৃত্ত পার হইয়া ক্রমশঃ উত্তরবর্ত্তী হইতে হইতে তিনমাসে ২৩॥০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তরবর্ত্তী হয়; ১০ই আষাঢ় হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে চলিতে চলিতে আর তিন মাস পরে অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন তারিখে আবার নিরক্ষবৃত্ত পার হয়। ঠিক্ সেইরূপ আবার ১০ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত তিন মাসে ২৩॥০ ডিগ্রি দক্ষিণে যায় ও পরে উত্তরমুখে চলিয়া ১০ই চৈত্র তারিখে পুনরায় নিরক্ষবৃত্তে উপস্থিত হয়।

সূর্য্যের এই ছয়মাস উত্তরায়ণ ও ছয়মাস দক্ষিণায়নের ফলে আমা-দের দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটে। এইটুকু মনে রাখিলে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত দূরে থাকিলে পৃথিবীর কোন্ স্থানে দিন কত বড় আর রাত্রি কত বড় হইবে, স্থির করিতে আর প্রয়াস পাইতে হয়না। কেবল একটা জ্যামিতির হিসাব আসিয়া পড়ে।

আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রেই জানে, নিরক্ষবৃত্তে বার মাসই দিবারাত্রি সমান থাকে; সেখানে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। আর উভয় মেরুতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি। এ সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের কিরূপ ধারণা ছিল দেখাইবার জন্য ভাস্করাচার্য্যের উক্তি গোলাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"যাবৎকাল সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরভাগে থাকে, তাবৎকাল উত্তরদেশে সূর্য্যোদয় নিরক্ষবৃত্তে সূর্য্যোদয়ের একটু পূর্ব্বে ঘটে, ও সূর্য্যাস্ত নিরক্ষবৃত্তে অস্তের একটু পরে ঘটে।" (নিরক্ষবৃত্তে চিরকালই ছয় টার সময় উদয় ও ছয় টার সময় অস্ত হয়। সুতরাং নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে দিবামান বার ঘণ্টার অধিক ও রাত্রিমান বার ঘণ্টার কম হয়)।

"সূর্য্য যখন নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করে, তখন ঠিক্ ইহার বিপরীত ঘটে।"

"নিরক্ষবৃত্তের উপরে দিবারাত্রি সর্ব্বদাই সমান।" "যে সকল স্থানের কুমেরু ও সুমেরু হইতে দূরত্ব ২৪ অংশের কম, সেই সকল স্থানে বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটে।"

"মনে কর কোন স্থান সুমেরু হইতে ১০ অংশ অন্তরে। নিরক্ষবৃত্ত হইতে সূর্য্য যত দিন ১০ অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তরে থাকিবে, তত দিন ধরিয়া সেই স্থানে সূর্য্যের অস্তই ঘটিবেনা; ততদিন সেখানে রাত্রি ঘটিবেনা। মেরুস্থলে এই নিমিত্ত ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি।"

"দেবগণ সুমেরুতে বাস করেন, ও কুমেরুতে দৈত্যগণের অধিষ্ঠান। নিরক্ষবৃত্তই তাঁহাদের উভয়ের চক্রবাল রেখা।"

"(১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ছয় মাস সূর্য্য নিরক্ষ-

বৃত্তের উত্তরে, অর্থাৎ দেবগণের চক্রবাল রেখার উর্দ্ধে রহে (চক্রবালের নীচে যায় না, সুতরাং অস্তগত হয়না)। আবার (১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত) ছয় মাস ব্যাপিয়া সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে অর্থাৎ দৈত্যগণের চক্রবালের উর্দ্ধে রহে; (ও দেবগণের চক্রবালের নিম্নে রহে)।"

"সূর্য্য যখন দেখা যায় তখন দিন; আর যখন দেখা যায়না তখন রাত্রি।" (অর্থাৎ চৈত্র হইতে আশ্বিন ছয় মাস সুমেরুস্থিত দেবগণের দিন· আর কুমেরুস্থ দৈত্যগণের রাত্রি, এবং আশ্বিন হইতে চৈত্র ছয়-মাস দেবগণের রাত্রি ও দৈত্যগণের দিন।)

বালকগণের পাঠ্য ইংরাজি পুস্তকে, অথবা তাহার তর্জ্জমা বাঙ্গালা পুস্তকে, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির এবং মেরুস্থলে দিবারাত্রির অর্দ্ধ বৎসর ব্যাপ্তির কারণ যেরূপে সচরাচর বুঝান থাকে, ভাস্করাচার্য্যের প্রণালী তাহার অপেক্ষা কৌশলময় ও সরল। আমার বিবেচনায় শিক্ষকেরা এই প্রণালী অবলম্বন করিলে এই বিষয় সহজে বালকগণের হৃদগত করাইতে পারিবেন।

বৎসরের মধ্যে ছয় মাস (দক্ষিণায়ন) ব্যাপিয়া দেবগণ নিদ্রিত থাকেন, ও ছয় মাস (উত্তরায়ণ) ব্যাপিয়া জাগ্রত থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রে লেখে। ইহার জ্যোতিষিক তাৎপর্য্য এই বার পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র, ইহারও মর্ম্ম সরল হইবে।

জ্যোতিষের মতে আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সুমেরুতে দেবগণের রাত্রি; আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে দেবগণের রাত্রি আষাঢ় হইতে পৌষ। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষের মতই অর্থযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিভেদটুকুর উল্লেখ

করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের প্রতি একটু তীব্র কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।

ভাস্করাচার্য্য মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত স্থলে দিবারাত্রির পরিমাণ বাহির করিবার একটি সুন্দর হিসাব দিয়াছেন। সূর্য্যের বিষুবসংক্রমণের দিন (আজ কাল যাহা ১০ই চৈত্র তারিখে ঘটে) সুমেরুতে প্রথম সূর্য্যোদয় ঘটে। তার পর প্রথম মাসে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১১ অংশ ৪৫ কলা পর্যান্ত যায়; তার পর দ্বিতীয় মাসে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত যায়; তার পর তৃতীয় মাসে ২৪ অংশ (প্রকৃত পক্ষে ২৩ অংশ ২৮ কলা) পর্য্যন্ত যায়। তার পর আর উত্তরে যায়না; ক্রমে দক্ষিণবর্ত্তী হয়। দক্ষিণ মুখে ফিরিবার সময় চতুর্থ মাসে ২৪ অংশ হইতে ২০ অংশ ৪০ কলায়, পঞ্চম মাসে ১১ অংশ ৪৫ কলায়, ও ষষ্ঠ মাসে নিরক্ষবৃত্তে পুনরায় হাজির হয়। তখন সুমেরুতে সূর্য্যাস্ত ঘটে। সুতরাং সুমেরু বিন্দুতে ছয় মাসই দিন। সুমেরু হইতে ১১ অংশ ৪৪ কলা দূরস্থ প্রদেশ পর্যান্ত (গ্রীনলণ্ডের উত্তর ভাগ, স্পিৎজ্‌বর্গেন দ্বীপের অধিকাংশ প্রভৃতি স্থলে) ক্রমাগত চারিমাস (১০ই বৈশাখ হইতে ১০ই ভাদ্র পর্যান্ত) ও ততোধিক কাল ব্যাপিয়া দিন। সুমেরু হইতে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্যান্ত দূরস্থ প্রদেশে (গ্রীনলণ্ডের মধ্যভাগ, নবজেম্লাদ্বীপ ও সাইবিরিয়ার উত্তর উপকূলে) দুই মাসের অধিক কাল ধরিয়া দিন (১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত)। ফলতঃ সুমেরু হইতে দূরত্ব জানিলেই সেই স্থানের দিবাভাগের পরিমাণ অনায়াসে এই হিসাবে নির্ণীত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য এই হিসাবটুকু বাহির করিতে গোলমিতির (Sphericial Trigonometry) সাহায্য আবশ্যক। ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে গোলতত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞতার অভাবে এই

হিসাব দিতে গিয়া বড়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন, এবং তাঁহারা ভাস্করের তীব্র বাক্যজ্বালাময় আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই। ভাস্কর বলেন, যে জ্যোতিষী গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোলশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অবিদ্যমানে অপরকে শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার চেষ্টা নিস্ফল বিড়ম্বনা মাত্র। ভরসা করি, ভাস্করের এই বাক্যে পাঠকগণের মধ্যে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেননা।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্বনির্দ্ধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা; এই দূরত্ব যে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা বোধ করি সাধারণ মানুষের কল্পনায় আসেনা। অমুক গ্রহ এত দূরে রহিয়াছে বলিলে বোধ করি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঁজাখুরি, তামাসা অথবা কবিত্ব বলিয়া উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েননা। তবে যাঁহারা শাস্ত্র ও বড় লোকের উক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সংখ্যার অল্পতা বা আধিক্য উভয়ই সমানভাবে জীর্ণ করিতে সমর্থ; তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির হজমি শক্তির সীমা নাই; তাঁহাদের অগ্নিমান্দ্যের কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অরণ্য ভেদ করিয়া, অথবা অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইয়া, কোন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একটু স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কারের সহিত ইঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ইঁহারা এত অকাতরে ও দ্বিধাহীনভাবে ও অসন্দিহানচিত্তে সেই আয়াসলব্ধ তথ্যটাকে এমন চিরপরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের স্পর্দ্ধা একবারে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহাদিগকে প্রভূতপরিমাণে বিনয়সম্পন্ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে বৈজ্ঞানিক গুরু সর্ব্বদা এরূপ বিনীত শিষ্যে প্রণয়বান্ হইতে চাহেননা।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্বনিরূপণের কথা। জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্র

সব চেয়ে নিকটে। দূরে একটা গাছ থাকিলে যেরূপে তাহার দূরত্ব বাহির হয়, ঠিক্ সেই প্রণালীতে চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইতে পারে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার লোকে চন্দ্রকে কোন্ থানে দেখে অর্থাৎ কোন একটা স্থির নক্ষত্র হইতে কত দূরে দেখে, ঠিক্ কর, এবং ঠিক্ সেই সময়ে মক্কার লোকে চন্দ্রকে আকাশচক্রের কোন্ স্থানে দেখে স্থির কর। কলিকাতা ও মক্কা এই দুই জায়গার দূরত্ব জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইবে। কলিকাতা ও মক্কা এই উভয় স্থান হইতে অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিয়া যে অবস্থিতির প্রভেদটুকু পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম parallax, দেশী সংস্কৃত নাম লম্বন। এই লম্বন নির্দ্ধারণ ব্যতীত দূরত্ব অবধারণের অন্য সুচারু উপায় নাই। সেকালেও এইরূপে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন নির্দ্ধারণ করিয়া দূরত্বের পরিমাণ হইয়াছিল। কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস যদি চন্দ্রের দূরত্বের সহিত তুলনায় নগণ্য হইত, তাহা হইলে, চন্দ্রোদয়ের সময়ে, অর্থাৎ চন্দ্র যখন চক্রবালের উপরে রহে সেই সময়ে, চন্দ্র আকাশের ঊর্দ্ধবিন্দু বা স্বস্তিক হইতে ঠিক্ ৯০ অংশ নিম্নে থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস চন্দ্রের দূরত্বের তুলনায় নগণ্য নহে; সুতরাং চন্দ্র প্রকৃত চক্রবাল ছাড়িয়া একটু উপর না উঠিলে আমরা উহার উদয় বুঝিতে পারিনা। উদয়কালে স্বস্তিক হইতে দূরত্ব ৯০ অংশের কিছু কমই হয়। এই তফাতটুকু চন্দ্রের তাৎকালিক লম্বন। তার পর পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব আপনা হইতে আসে। এই উপায়ে চন্দ্রের দূরত্ব সেকালে নির্ণীত হইয়াছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা, এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ আটশত যোজন; এই হিসাবে চন্দ্রের ভ্রমণপথ

৩২৪০০০ তিনলক্ষ চব্বিশহাজার যোজন, ও চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৫১৫৭০ যোজন। আধুনিক কালে গৃহীত চন্দ্রের দূরত্বের সহিত মিলাইতে হইলে এই যোজনের সহিত মাইলের সম্বন্ধ জানা আবশ্যক; কিন্তু এই সূর্য্যসিদ্ধান্তের যোজন কয় মাইলের সমান, তাহা স্থির জানিবার কোন উপায় আছে কিনা বলিতে পারিনা। এই যোজন আমাদের চারি-ক্রোশের সমান নহে, তাহা নিশ্চিত। আর্য্যভট্ট যে যোজনের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চারিক্রোশ পরিমিত; প্রাচীন জ্যোতিষবিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে সেই যোজনের পরিমাণে পৃথিবীর পরিধি কত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের আটশত ভাগের এক ভাগের নাম এক যোজন। এইরূপে যোজনপরিমাণের নির্দ্দেশ কিছু রহস্যজনক বলিতে হইবে। একশত বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা এইরূপে তাহাদের metre স্থির করিয়াছিল। ফরাসীদের মীতার পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশের (অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু পর্য্যন্ত দূরত্বের) এককোটি ভাগের এক ভাগ। যাহাই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে পৃথি-বীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ যোজন, ও পরিধি ৫০৫৯ যোজন। প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবীর পরিধি ইংরাজি ২৫০৮০ মাইল। হইতে পারে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিধির যে পরিমাণ ধরিতেন, সূর্য্য-সিদ্ধান্তকার তাহা হইতে একটু ভিন্ন ধরিতেন। বস্তুতই ভাস্করা-চার্য্যের নির্ণীত ভূপরিধির পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত পরিমাণের অপেক্ষা কিছু কম। সে কালে প্রাচীন শাস্ত্রের লেখা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়ার প্রথা ছিলনা। প্রাচীন উক্তির সংশোধনে সেকালের লোকে সাহসী হইতেন। যাহাই হউক মোটামুটি ৫০৫৯ যোজন ২৫০৮০ মাইলের সমান ধরিয়া লইলে, চন্দ্রের দূরত্ব ৫১৫৭০ যোজন প্রায় ২৫৫০০০

দুইলক্ষ পঞ্চান্নহাজার মাইলের সমান দাঁড়ায়। ইংরাজি মতে চন্দ্রের দূরত্ব গড়ে ২৩৮০০০ দুইলক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল। পাঠকগণ উভয় অঙ্কের তুলনা করিবেন, ও সেই সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতেও ভুলিবেননা।

চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইলে চন্দ্র কত বড় আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। চন্দ্র এত দূরে আছে যে, উহার মণ্ডল আকাশের বত্রিশ কলামাত্র স্থান (প্রায় সূর্য্যমণ্ডলের সমান স্থান) ব্যাপিয়া আছে। চন্দ্রের ভ্রমণপথ, যাহা ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, তাহার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন; সুতরাং চন্দ্রের ব্যাস, যাহা বত্রিশ কলামাত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা ৪৮০ যোজনমাত্র, ত্রৈরাশিক অঙ্কে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত হিসাবে ৪৮০ যোজন প্রায় ২৩৮০ মাইলের সমান। আধুনিক মতে চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল।

লম্বন অথবা parallax হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ও আয়তন নিরূপিত হয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা; আজ কাল দেখা গিয়াছে, চন্দ্রের লম্বন প্রায় ৫৭ কলা। এই কলাপরিমাণের বিভেদের হেতু আধুনিক গণনার সহিত সেকালের গণনার যা কিছু প্রভেদ। অবশ্য সেকালের প্রাচীনত্ব ও যন্ত্রাদির অবস্থা বিবেচনা করিলে এই প্রভেদটুকু ধরিবার মত নহে।

চন্দ্রের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা জানি চন্দ্রের কেবল একটামাত্র পৃষ্ঠ সর্ব্বদা পৃথিবীর অভিমুখে থাকে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এক চক্র ঘুরিয়া আসিতে আসিতে নিজ ধ্রুবরেখার বা অক্ষরেখার উপর তিনশত সওয়া ছবট্টি পাক আবর্ত্তন করিয়া থাকে, চন্দ্রের পক্ষে তেমন নয়। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীর চারিদিকে এক চক্র ঘুরে, নিজের ধ্রুবরেখার চারিদিকে ঠিক সেই

সময়েই এক পাক আবর্ত্তন করে। গোলাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি উক্তি দেখা যায়। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে, অর্থাৎ যে পৃষ্ঠ আমরা কখন দেখিতে পাইনা, সেই পৃষ্ঠে পিতৃগণের বসতি। আমাদের অমাবস্যার দিনে পিতৃগণের মধ্যাহ্নকাল, সূর্য্য তখন তাঁহাদের মস্তকোপরি; আমাদের পূর্ণিমার দিনে তাঁহাদের মধ্যরাত্র; আমাদের এক চান্দ্রমাসে তাঁহাদের এক অহোরাত্র। চন্দ্রলোকবাসী পিতৃগণের দিবামান আমাদের একপক্ষ ব্যাপী ও তাঁহাদের রাত্রিমানও আমাদের একপক্ষব্যাপী। বস্তুতই তাহাই।

আর্য্যজাতি।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বিধাতা আপন মস্তক হইতে ব্রাহ্মণের, বক্ষোদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে এই চারি ভিন্ন আর জাতি নাই; এবং এই পুরাতন চারি-জাতি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সহস্রজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক কথা, এই চারিজাতি মনুষ্যের মধ্যে, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ ও মাথার বলে শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ ও বাহুবলে শ্রেষ্ঠ; বৈশ্য পীতবর্ণ ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের দাসত্বই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জাতিভেদের মূলে এই বর্ণভেদ; এবং ভারতবর্ষে ভাষায় অদ্যাপি জাতিশব্দের অপর পর্য্যায় বর্ণ।

কৌতুক এই যে, প্রকৃত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলে এই পৌরাণিক আখ্যানের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে মোটামুটি চারিজাতিতে বিভাগ করিবার প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহি-য়াছে। ককেশীয় জাতি, আর্য্যজাতি যাহার প্রধান শাখা, সেই জাতি আপনার শ্বেতচর্ম্ম ও প্রকাণ্ড মাথা লইয়া অদ্যাপি সমগ্র পৃথিবী আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। আদিম আমেরিক তাম্র বা রক্ত বর্ণের জন্য ভূগোলবিবরণে বিখ্যাত, এবং তাহাদের বাহুবলের জন্য সম্যক্‌ খ্যাতি আছে কি না জানিনা; তবে মহাভাগ খ্রীষ্টানদিগের শুভ পদার্পণের পূর্ব্বে, আমেরিকার লোকে মিশর, কালদিয়া ও গ্রীস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াও বড় বড় সাম্রাজ্যস্থাপনে ও উন্নত সভ্যতা সৃজনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাই। মোগল-

জাতীয় চীনাম্যানের প্রধান পরিচয় পীত বর্ণ; এবং শুনা যায়, এই চীনাম্যানই প্রথমে দিগ্‌দর্শন শলাকার তথ্য আবিষ্কার করিয়া সমুদ্রযাত্রা সুগম করিয়াছিল। আর মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি নিগ্রহের ও উৎপীড়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যতই ব্যথিত হউক না, কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেতাঙ্গের দাস্যে জীবন অতিবাহিত কেন না করিবে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হইত ও হইয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে এইরূপ একটা সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ের কারণ দেখিনা। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্বেতবর্ণ মনুষ্যজাতিসম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা কত দূরে আসিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্যকাল হইতে আমরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ, গ্রীক ও জর্ম্মান, পার্সী ও হিন্দু, একই মানববংশে উৎপন্ন ও পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বন্ধবান্। এই প্রাচীন মানববংশ একটি বিশেষ সুগঠিত সুন্দর ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, একই দেবতার আরাধনা করিত, এবং কাস্পীয়সাগরের ধারে অথবা পামির মালভূমির নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে অধিবাস করিত। কালক্রমে বংশবিস্তারসহকারে বা খাদ্যাভাবে বা পার্শ্বস্থ জাতির আক্রমণে আদিম-বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কেহ পশ্চিমে কেহ বা পূর্ব্বে যাত্রা করে, এবং কালক্রমে পশ্চিমে আৎলান্তিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলে। সেই সেই প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এই বৈদেশিক অতিথির পদার্পণানুগ্রহে সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আগনাদের গরু ভেড়া

ও বাস্তভিটা পর্য্যন্ত অতিথিসৎকারে নিয়োজিত করিয়াও নিষ্কৃতি পায় নাই। এমন কি, অধিকাংশ স্থলে আপনাদের অস্তিত্ববার্ত্তা পর্য্যন্ত এতদূর নিষ্কামভাবে লুপ্ত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্তর আক্ষেপ ও গবেষণা সত্ত্বেও তাহার উদ্ধার হইতেছেনা। যাহাই হউক, শ্বেতকায়গণের এই আতিথ্যগ্রহণস্পৃহাটা অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে; এবং এই ক্ষুদ্র ধরাখানার মধ্যেও কত বড় সাহারা দেশটাকে মরুভূমি ও মেরুপ্রদেশটাকে বরফভূমি করিয়া বিধাতা তাঁহাদের বাসস্থানের পরিধি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বিধাতার এই নিষ্করুণ কার্পণ্যের সুচারু কৈফিয়তও পাওয়া যাইতেছেনা।

আমাদের পঞ্চনদবাসী পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন, এবং সার উইলিয়াম জোন্সের পর হইতে ইউরোপীয়েরাও আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞাতি সাব্যস্ত করিয়া সেই নামে পরিচিত করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদের জ্ঞাতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত; এবং অপরের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরাজেরা যে নিশ্চয়ই বানরের বংশধর, ডারুইনের মতের এইটুকু গ্রহণ করিতে আনন্দসহকারে প্রস্তুত। তথাপি বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের আর্য্যত্ব স্বীকৃত ও আর্য্যশব্দ পাশ্চাত্যগণের প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

এই স্থলে ইউরোপীয়দের আর্য্যত্বে অধিকারবিষয়ক যুক্তির একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রধানতম ও প্রবলতম যুক্তি ভাষাগত ঐক্য। ফলে ইংরাজ ও জর্ম্মান ও পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী একই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এবং ভাষাগত ঐক্যের মূলে শোণিতগত বা জাতিগত ঐক্য না থাকিলে এত বড় হেঁয়ালিরও কোন অর্থ হয়না। অপিচ, ইংরাজের ভাষার ও বাঙ্গালীর ভাষার

সাদৃশ্য ও বিভেদ পর্য্যালোচনা করিয়া, যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একত্র পাশাপাশি অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়েও কতকটা স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এমন কি, এই ভাষাবিচার হইতে তাহাদের আদিম বাসস্থান পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে। তবে যেমন কোন সিদ্ধান্তেই সকল পণ্ডিতকে কখন এক মত গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই, এখানেও সেইরূপ দুই মত রহিয়াছে। আর্য্যভাষাসমুদয়ের ব্যবচ্ছেদ ও তুলনায় আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আর্য্যজাতির প্রথম বাসস্থান ছিল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে; আর কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, সুইডেনের উত্তরে। কাস্পীয়সাগর আর সুইডেন; পুরাতত্ত্বে এইরূপ ঈষৎ মতদ্বৈধ দেখিয়া বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কাজ।

এই ভাষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান আর্য্য-জাতীয় মনুষ্যগণকে ছয় প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ছয়ের মধ্যে চারি শাখা ইউরোপে, ও দুই শাখা এসিয়া মহাদেশে বসতি করিতেছে। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন, গ্রীক-রোমান ও স্লাব, এবং এসিয়া মহাদেশে পারসীক ও হিন্দু। এই ছয় শাখা লইয়া আর্য্যজাতিরূপ মহাবৃক্ষ। ইহার মূল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে বা সুইডেনের উত্তরে কোন স্থানে সংস্থিত ছিল। ইহার শাখাপ্রশাখা সমগ্র ইউরোপ ও দক্ষিণ এসিয়ায় বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমগ্র ধরাভাগ ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। সমগ্র ধরাভাগ ইহার ছায়ার আশ্রয়ে "সুশীতল" হইতেছে; ইহার শোভা, ইহার ঐশ্বর্য্য, ইহার সমৃদ্ধি পৃথিবীতে তুলনাবিরহিত; তবে ইহার আওতা ক্ষুদ্র আগাছার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর।

এই সিদ্ধান্তটা স্থূলতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত, ইহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইবার সম্যক্ কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে কোন দেশবিশেষে একটা বিশেষলক্ষণাক্রান্ত মানববংশ বসতি করিত; সেই বংশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে শোণিত-গত ও জন্মগত সম্বন্ধ ছিল, অর্থাৎ তাহারা পীতবর্ণ মোগল ও কৃষ্ণকায় কাফ্রি ও তাম্রবর্ণ আমেরিক হইতে স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত জীব ছিল;—সেই জাতির নাম হউক "আর্য্যজাতি"। তাহারা একটা বিশেষ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত; সেই ভাষা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় সম্পত্তি, তাহাদের নিজস্ব ছিল;—তাহার নাম হউক "আর্য্যভাষা"। তদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূল ঐক্য ছিল; অতএব সেই প্রাচীন ধর্ম্মের নাম হউক "আর্য্যধর্ম্ম"। সেই আর্য্যভাষাভাষী আর্য্যধর্ম্মাশ্রয়ী আর্য্যজাতি কালে সমগ্র পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং অধুনাতন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মনুষ্যগণের অনেকে অদ্যাপি সেই প্রাচীন আর্য্যগণেরই বংশে জন্মিয়াছে; কাল-সহকৃত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহি-তেছে, এবং হয়ত সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকেই রূপান্তরিত করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এপর্য্যন্ত স্থূলতঃ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে কয়েকটা এইরূপ প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উত্তরের দরকার হয়। সম্প্রতি যাহারা আর্য্যভাষায় কথা কহে, ও আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, সকলেই প্রকৃতপক্ষে আর্য্যনামে অধিকারী বটে কি না? প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবী ছাইবার পূর্ব্বে কোন-না-কোন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিত;—সে কোন্ স্থান? প্রাচীন আর্য্যজাতি কোন-না-কোন্ সময়ে

প্রাচীন বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দিগন্তে বাহির হয়;—সে কোন্ সময় ?

এ কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু সন্দেহের কারণ জন্মে।

ভাষাগত ঐক্য ধরিয়া জাতিগত ঐক্য স্থাপন করিতে গেলে অনেক সময়ে ভুল হয়। ভাষাপরিবর্ত্তন পৃথিবীর ইতিহাসে নিত্য ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়, সময়ে সময়ে এক একটা সমগ্র সম্প্রদায় অথবা সমগ্র জাতি অকস্মাৎ আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতৃজাতির ভাষা গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করে। আধুনিক ফরাসী ও স্পানিস ভাষা লাতিন হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফরাসী ও স্পানিস জাতি রোমক জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তত্তৎ প্রদেশের অধিবাসিগণ রোমসাম্রাজ্যের অধীনতার সময়ে রোমক-দের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে খাঁটি জর্ম্মান নর্ম্মা-নেরা ফরাসী দেশে বাস করিয়া ফরাসী ভাষা গ্রহণ করে। ওয়েলশ ও আইরিশগণ ক্রমে আপন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ভাষা গ্রহণ করিতেছে। কাফ্রি অনেক স্থলে শাদা প্রভুদের নিকট হইতে খ্রীষ্টানির সহিত ভাষাপর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা দেশে লাল, শাদা ও কালো, এই ত্রিবিধ বর্ণসমন্বয়ে যে সকল অপূর্ব্ব সুচারু সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা ইউরোপীয় ভাষায় কথা কহে। অথবা অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি, যখন আমাদের মধ্যেই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে ও কথা কহিতে লজ্জা অনুভব করেন ?

এই সকল দেখিয়া কেবল ভাষার সাহায্যে জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা

ভাষায় কথা বলে, অতএব সে আর্য্যসন্তান ; অমুক ব্যক্তি ইংরাজি কহে, অতএব সে আর্য্য টিউটন, এরূপ বিচার অন্যায় ও অসঙ্গত।

সুতরাং জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অন্য পন্থার অবলম্বন আবশ্যক। মানুষে কি ভাষায় কথা কহে, কেবল ইহা দেখিলে চলিবেনা। গায়ের রঙটা কেমন, মুখখানা গোল না দীঘল, চুলগুলা কোমল না কর্কশ, চোখ কালো না কটা, নাক উচু না বসা, এই সকল দেখা দরকার হইয়া পড়িবে। এবং এই সকল দেখিয়া মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমগ্র মানব জাতিকে কয়েকটি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপের সকল লোকেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কেবল পিরিনীস পর্ব্বতের নিকট বাস্ক নামে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও উত্তর রুশিয়ার লাপ জাতির ও ফিন জাতির কেহ কেহ যে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা আর্য্যভাষা নহে। স্থূলতঃ ইউরোপের সকলেই আর্য্যভাষা-ভাষী, ও এই কারণে সকলেই আর্য্যজাতীয় বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু আকার অবয়বের তুলনা করিলে বিভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন গঠনের লোক দেখা যায় যে, তাহাদের সকলকেই এক বংশে উৎপন্ন বলিতে জীববিদ্যা রাজী নহেন। ইউরোপের দক্ষিণভাগে ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী দেশের লোকের আকৃতি কিছু খর্ব্ব, চুল কালো, চোখ কালো, বর্ণ অপেক্ষাকৃত ময়লা, মুখের অবয়ব কাহারও গোলাকার, কাহারও বা ঈষৎ দীর্ঘ। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের গঠন অনেকাংশে পৃথক্ ; তাহাদের আকৃতিতে শালপ্রাংশুত্ব ও মহাভুজত্ব বর্ত্তমান, বর্ণ ধপ্‌ধপে শাদা ; বদনকে মণ্ডল বলিলে ভুল হয় ; চুল রক্তবর্ণ অথবা ইংরাজি কাব্যের অনুরোধে সুবর্ণবর্ণ, আমাদের বিচারে কটা ; চক্ষু নীল। আবার অনেক লোক দেখা যায়, তাহাদের গঠনে উভয় জাতির লক্ষণই কিছু না কিছু বিদ্যমান ; ইহারা উভয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন,

তাহার সন্দেহ নাই। এবং এই মিশ্রজাতীয় লোকের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যভাগেই অধিক।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয়, ইউরোপের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ তিনটা অথবা অন্ততঃ দুইটা বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপন্ন। অনুমান হয়, উত্তর অঞ্চলের লোকেই, স্থূলতঃ আর্য্য। সর্ব্বত্রই আর্য্যে অনার্য্যে অল্পবিস্তর মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্র আর্য্যের বা খাঁটি অবিমিশ্র অনার্য্যের সংখ্যা অধিক মিলে কি না, সন্দেহের স্থল।

ইংরাজেরা আপনাদিগকে আর্য্য টিউটন বলিয়া পরিচয় দেন। ওয়েলস, কর্ণবাল, স্কটলণ্ডের উত্তর ভাগ ও আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ভাগের লোকে কেল্টিক ভাষায় কথা কহে, ও আপনাদিগকে কেল্টিক আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেয়। কেল্টিক ও টিউটনিক উভয়ই আর্য্য ভাষা; তবে উভয় ভাষায় কালক্রমে যতটা তফাত দাঁড়াইয়াছে, কেল্ট ও টিউটনের শারীরিক গঠনে অবশ্যই ততখানি পার্থক্য জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা। ভাষা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, জীবশরীরের গঠন তত শীঘ্র বদলায়না। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড, তিন প্রদেশের অধিবাসীদের একই রকম গঠন হওয়া উচিত; নতুবা উহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, তিন প্রদেশেরই অনেক অধিবাসীর গঠনে আর্য্যেতর লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেক খাঁটি ইংরাজ, অথবা আইরিশ, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যভাষায় কথা কহেন, তাঁহাদের শরীর খাটো, মুখ গোল, চুল ও চোখ কালো;—দেখিলেই তাঁহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই কয়টা কথা পাওয়া

যায়। অতি প্রাচীন কালে,—কত পূর্ব্বে তাহা সম্প্রতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে না,—ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের যোগ ছিল; মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিলনা। তখন ইউরোপে সুতরাং ইংলণ্ডে, খর্ব্বাকৃতি জাতিবিশেষ বাস করিত। তাহারা পাথর ছুড়িয়া শীকার করিত ও লড়াই করিত। কালে সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল বিস্তৃত হিমানীস্তরে আবৃত হয়। এই আকস্মিক শীতোৎপত্তির কারণ কি, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইউরোপের তদানীন্তন মনুষ্য এই হিমের দৌরাত্ম্যে অনেকাংশে লুপ্ত বা স্থানত্যাগী হইয়া দক্ষিণমুখে ক্রমে পলায়ন করে। কালে হিমের আচ্ছাদন গলিতে থাকে; কালে সেই মহাদেশ-ব্যাপী বরফের আস্তরণের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। এখনও সেই হিমরাশি সর্ব্বত্র গলে নাই। এখনও আলপস পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগে সেই হিমরাশি পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান। এখনও ইউরোপের উত্তরে মেরুপ্রদেশ সারা বৎসর সেই হিমস্তরে আবৃত থাকে। এখনও সমগ্র গ্রীনলণ্ড দেশ হিমে আচ্ছাদিত। ক্রমশঃ শীতের অপগমে ইউরোপ সেই হিমাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করে; আবার জীবজন্তুর অধিবাসের উপযোগী হয়। প্রাচীন খর্ব্বকায় মনুষ্য হিমস্তরের পরাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উত্তরমুখে অগ্রসর হয়। ম্যামথের অস্থির সহিত তাহাদের অস্থিপঞ্জর ভূস্তরমধ্যে নিহিত রাখিয়া যায়। এই সময়ে আর একটি জাতি আসিয়া দক্ষিণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলে, এবং পূর্ব্বতন খর্ব্বাকৃতি অধিবাসিগণকে আরও উত্তরে দূরীভূত করে। সেই অবধি ইউরোপে ইহাদের আর বড় চিহ্ন রহিলনা। হয়ত বর্ত্তমান খর্ব্বকায় এস্কিমো জাতি অদ্যাপি তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে। নবাগত মনুষ্যেরা কালো চোখ কালো চুল ও লম্বা মাথা লইয়া দক্ষিণ ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল।

ইহারাও ধাতুর ব্যবহার প্রথমতঃ জানিতনা; পাথর কাটিয়া বিবিধ সুন্দর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। আর্য্য গ্রীক অথবা হেলীনেরা বোধ হয় ইহাদিগকেই জয় করিয়া ও দাসত্বে আনয়ন করিয়া গ্রীসের ইতিহাসে আরম্ভ করেন।

ইহাদের পর আরও একটি অনার্য্য জাতি ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। সমগ্র মধ্য ইউরোপে ইহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। ইহাদেরও কালো চুল ও কালো চোখ; অধিকন্তু ইহা-দের বদনমণ্ডল প্রকৃতই মণ্ডলাকৃতি। ক্রমশঃ অধিকার প্রসারিত করিয়া ইহারা সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয়, এবং দক্ষিণাঞ্চলের পূর্ব্বতন দীর্ঘানন অধিবাসীদিগকে আপনাদের সহিত মিশাইয়া ফেলে।

ইহাদের পর আর্য্য জাতি আইসে। আর্য্যজাতির দৈহিক লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ছিল। ইহারা যেখানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই-খানেই পূর্ব্বতন অধিবাসীকে পরাজিত করিয়া আপন ধর্ম্ম, আপন ভাষা, আপন আচার অবলম্বন করাইয়াছে। আর্য্যেতর ভাষা, আর্য্যেতর ধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বত্র মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; তবে অনার্য্যের দৈহিক গঠন একবারে লুপ্ত হইবার নহে। এই আর্য্যেরাই হয়ত বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই আর্য্য। পূর্ব্ব হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিমগামী, উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণগামী হইয়াছে। উহা-দের ধর্ম্ম ও ভাষা বিজিত ভূখণ্ডে প্রবল হইয়াছে। প্রাচীন মানবগণের ভাষা ও ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি সেই অনার্য্য ভাষা হয়ত দুই এক জায়গায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিরিনীস্-পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বাস্ক ভাষা সেই প্রাচীন কালের অনার্য্য জাতির ভাষা। বাস্কভাষী অনার্য্য

গণ, যাহারা আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে প্রায় সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ ইউ-রোপে বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগকে আইবিরীয় নাম দেওয়া হয়। অনার্য্য ভাষা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু শারীরিক গঠন ধরিয়া বিচার করিলে দক্ষিণ ইউরোপের লোক আর্য্যধর্ম্মা হইলেও স্থূলতঃ অনার্য্যবংশজ। মধ্য ইউরোপের লোক বংশে সঙ্কর। উত্তরাঞ্চলের লোকে স্থূলতঃ খাঁটি আর্য্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ধরিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। ব্রিটিশ দ্বীপে পূর্ব্বে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্য কেল্ট আসিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়। অনার্য্য আর্য্যের সহিত মিশে নাই। আর্য্যই অনার্য্যের সহিত মিশিয়াছিল। ভাষা ছিল পূর্ব্বে অনার্য্য বাস্কজাতীয়; ভাষা হইল আর্য্য কেল্টিক। পরে রোমানেরা এই আর্য্যভাষাভাষী অনার্য্য জাতিকে পরাস্ত করিয়া খ্রীষ্টীয় ও রোমান সভ্যতা প্রদান করে। তবে তাহারা ভাষার বা শোণিতের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অবসর পায় নাই। পরে জর্ম্মনি হইতে প্রায় খাঁটি আর্য্য জর্ম্মান আসিয়া ব্রিটিশ দ্বীপ ক্রমে অধিকার করে ও পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সহিত মিশে। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কেল্টিক ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়। পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অদ্যাপি কেল্টিক ভাষা লোপ পায় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীতে আর্য্যত্বের মাত্রা অধিক, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীতে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। স্পেন দেশে ও ফরাসী দেশে বাস্কভাষী অনার্য্য আইবিরীয়গণ বাস করিত। ফরাসী দেশের কতক অংশে আর্য্য অধিকার বিস্তারের সহিত কেল্টিক ভাষা ও রীতি নীতি চলিত হয়। রোমানেরা উভয় দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া আর্য্য রোমক ভাষা প্রচলিত করে। শোণিত মূলতঃ অনার্য্যই রহিয়া যায়। পরে রোমসাম্রাজ্যের পতন ও জর্ম্মন বিপ্লবের সময়, ফরাসীর পূর্ব্বোত্তরভাগে

আর্য্যগণের প্রবল মাত্রায় আমদানি হয়। এক্ষণে স্পেনবাসী স্থূলতঃ অনার্য্যবংশীয় আর্য্যভাষী। দক্ষিণ ফরাসীর পক্ষেও তাহাই বক্তব্য। উত্তরপূর্ব্ব ফরাসীতে স্থূলতঃ আর্য্য কেল্ট ও আর্য্য টিউটনের অধিবাস; ভাষা সর্ব্বত্র আর্য্য রোমক।

প্রাচীন রোমানদের জাতিনির্ণয় দুরূহ। প্রাচীন রোমকেরা উত্তর হইতে আগত গল জাতি দ্বারা পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইত। তাৎকালিক গলদিগের যেরূপ বিবরণ আছে, ও পরবর্ত্তী ইতিহাসে জর্ম্মনদিগের যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল বোধ হয়না। গল ও জর্ম্মন উভয়েরই প্রকাণ্ড কলেবর ও সুনীল চক্ষু রোমক ঐতিহাসিকের নিকট প্রশংসা অধিকার করিয়াছিল। এই গলেরা আবার পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গল ও জর্ম্মন উভয়েই প্রায় খাঁটি আর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। রোম-কেরা স্বয়ং বোধ করি সঙ্কর জাতিভুক্ত ছিল। তাহারা আর্য্য ভাষায় কথা কহিত ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রাচীন অনার্য্য আইবিরীয় জাতি, বোধ হয়, আর্য্যগণের সহিত কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া ইতালীর বিভিন্ন সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

গ্রীস দেশে মণ্ডলানন আইবিরীয় জাতির বোধ করি বিস্তার হয় নাই। সেখানে দীর্ঘাননশালী অনার্য্যেরই বসতি ছিল। আর্য্য হেলীনেরা আসিয়া ইহাদিগকেই জয় করে ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজের উচ্চতর স্তরে আর্য্যত্ব ও নিম্নতর স্তরে অনার্য্যত্ব প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টানির বিস্তারে উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে।

জর্ম্মনির দক্ষিণ ভাগে সঙ্কর জাতিরই অধিক প্রাদুর্ভাব। উত্তর জর্ম্মনিতে ও স্কান্দিনেবিয়াতে বিশুদ্ধ আর্য্যের সংখ্যা বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র অপেক্ষা অধিক।

রুশিয়ার ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকে স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে। স্লাবনিক ভাষা আর্য্যভাষার শাখামাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন ব্যক্তি স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে, সেই আর্য্য বংশধর, এমন নহে। এমন কি, রুশিয়াতে যতটা বর্ণসাঙ্কর্য্য ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ততটা অন্যত্র হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও ঠিক্ এই ইতিহাস। দক্ষিণাপথে অধিকাংশ লোকই আর্য্যধর্ম্মা, কিন্তু অনার্য্যভাষী ও অনার্য্যবংশীয়। আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসমাজে উচ্চস্তরে আর্য্যত্বের ও নিম্নস্তরে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। ভারতবিজেতা আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সহজে মিশিতে চাহিতেননা। তথাপি মিশ্রণের নিবারণও অসাধ্য ছিল। দ্বিজাতির সংখ্যা পূর্ব্বেও অল্প ছিল, এখনও অল্প আছে। সেকালে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যাবিবাহ বৈধ বিবাহের অন্তর্গত ছিল। ফলে আমরা যতই আর্য্যত্বের স্পর্দ্ধা করি না, শ্বেত চর্ম্ম ও নীল চক্ষুর প্রাদুর্ভাব আমাদের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যেও দেখা যায়না। প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ আয়তন ও উন্নত নাসা মাত্র দেখিয়াই আজকাল আমাদের মধ্যে আর্য্যত্বের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যাতপ চর্ম্মের বর্ণবিকারের জন্য কতকটা দায়ী হইতে পারে, কিন্তু কতকটা মাত্র। বেদমার্গানুযায়ী হিন্দুশাস্ত্র কঠিন নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা দ্বিজাতির বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধ বিপ্লব ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকের সমবেত প্রয়াসে সেই বিশুদ্ধির যথেষ্ট অপচয় ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নীচকে উচ্চে তুলিয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চকেও নীচে নামাইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুরাতন প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, নিরূপণ দুষ্কর। অতি প্রাচীন কালে মধ্য এশিয়ার পশ্চিমভাগ বিশাল গভীর মহাসাগরতলে নিমগ্ন ছিল, ভূবিদ্যা এই কথার প্রমাণ করে। পশ্চিমে ইউরোপখণ্ড ও পূর্ব্বে এশিয়াখণ্ড, এই মহাসাগর কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন ছিল। মধ্য ইউরোপ ধৌত করিয়া সমুদয় জলরাশি বিশাল নদ নদীর আকারে এই মহাসাগরে পতিত হইত; ইরাণ ও হিন্দুকুশের মালভূমি ধৌত করিয়া বড় বড় নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া এই মহাসাগরে পতিত হইত। এই মহাসাগর প্রকৃতই তাৎকালিক ভূমধ্যসাগর ছিল। বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও উত্তর ইউরোপের উত্তরাংশ তখন উত্তর মহাসাগরের গর্ভে মগ্ন ছিল। উত্তর মহাসাগরের সহিত হয়ত সেই পুরাকালীন ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ছিল। বোধ হয়, এই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রাচীন পীতকায় তাতার বা তুরাণ জাতি বসতি করিয়া পূর্ব্বএশিয়াখণ্ডে আধিপত্য করিত। সেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে শ্বেতকায় আর্য্যগণ ধীরে ধীরে আপন গার্হস্থ সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পশ্চিমগামী হইয়া ইউরোপের পুরাতন অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, বা স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মিশ্র সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন।

কালক্রমে সেই ভূমধ্যসাগরের তলদেশ ভূগর্ভাগত শক্তির বলে উত্তোলিত হইতে থাকে। মহাসাগরের পরিধিসীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। উহার জলরাশি উত্তরমুখে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে মিশিতে থাকে। অদ্যাপি ওবিনদী সেই পথে সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত সাইবিরিয়ার প্রান্তর ভেদ করিয়া উত্তরমুখে বহিতেছে। সাগরগর্ভ ক্রমশঃ উত্তোলিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। মহাসাগর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জল

এখনও শুকায় নাই। বৈকাল ও বালকাশ, বিস্তীর্ণ আরাল, কাস্পীয় ও কৃষ্ণসাগর অদ্যাপি স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন বিশাল মহাসাগরের পুরাতন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বলগা ও দানিউব, আমু দরিয়া ও শিরদরিয়া, অদ্যাপি পূর্ব্বের মত পশ্চিমে ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া ধুইয়া লইয়া সেই মহাসাগরের গর্ভদেশ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসাগরের গর্ভ উত্তোলিত হইয়া স্থলে পরিণত হইলে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ সাধিত হয়। তখনই বোধ করি পশ্চিমবাসী আর্য্যগণের কেহ কেহ সেই স্থলপথে আসিয়া ইরাণের উত্তরে পামিরের নিম্নে আরাল ও কাস্পীয়সাগরের তটবর্ত্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই স্থানে ইঁহাদের প্রাচ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচ্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে বা কিছু কাল পরে এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে মানবজাতির ইতিহাসের আরম্ভ। এশিয়াদেশে তখন পুরাতন বিবিধ মানবসম্প্রদায় উন্নতির পন্থায় আরোহণের চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বে তাতারজাতি চীন সাম্রাজ্য ও চীনসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের তটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে কালদীয় জাতি আপন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। দূরে নীল নদতটে সূর্য্যোপাসনার প্রচারের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল আবিষ্কারের আরম্ভ হইতেছিল।

মধ্য এশিয়াতে জল যত শুকাইতে লাগিল, সমুদ্রগর্ভ উত্তোলিত হইয়া কোথাও অনুর্ব্বর প্রান্তর কোথাও বা মালভূমি বা মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, অন্নার্থী উগ্রস্বভাব পীতকায় মোগলেরা ততই স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সরিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহাদেরই পীড়নে আর্য্যগণ দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া হিন্দুকুশের ও ইরাণের মালভূমি

আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। প্রতাপান্বিত ব্যাবিলন ও নিনেবের ভূপতিগণ বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। পূর্ব্বমুখে যাইবার ও বোলানের গিরিসঙ্কট পার হইয়া কেহ কেহ সপ্তসিন্ধু-তীরে উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতভূমে তখন ক্ষুদ্র-কায় কৃষ্ণবর্ণ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতি বাস করিত। ইহারা ক্রমশঃ আর্য্যসমাজে গৃহীত হইয়া আর্য্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড হিন্দু জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে আর্য্য মীদিক ও পারসীক কিছু দিন পরে ব্যাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া বিক্রান্ত পারসীক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহার পর হইতে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়না। সুতরাং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

ইতিহাসে লেখে, পারসীকদিগের সহিত উত্তরাঞ্চলবাসী সীদিয় বা শকজাতির সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সীদিয় জাতির যেরূপ বিবরণ দেন, তাহাতে অন্ততঃ আকারঅবয়বে তাহারা আর্য্যজাতিরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হইতে পারে তাহারা আর্য্য ও মোগল উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মোগল বা তাতার জাতি। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসার উপায় নাই। আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পর শকজাতি পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রাচীন অযোধ্যাবাসী শাক্যজাতি ও শাক্য জাতির কুলপ্রদীপ কুমার সিদ্ধার্থের সহিত এই শকজাতির কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, বলা যায়না। উত্তরকালে শকজাতি বাহ্লীকের গ্রীকগণের স্থাপিত যবনরাজ্যের ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আপতিত হয়। মহারাজ কনিষ্কের সময় শকজাতির আধিপত্য মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শকজাতি আর্য্যবংশীয় ছিল কি না বলা

যায়না; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতবর্ষের সমাজে তাহাদের বাসচিহ্ন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

মধ্যএশিয়া এখনও শুকাইতেছে। এখনও সময়ে সময়ে মধ্যএশিয়া হইতে উগ্রস্বভাব পীতবর্ণ অনার্য্য দলে দলে বাহির হইয়া মানবের সভ্যতা ধ্বংস করিবার জন্য বাহির হয়। পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে আতলান্তিক পর্য্যন্ত সমগ্র মহাদেশ তাহাদের ভয়ে চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হূনজাতি পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া ইউরোপবাসী আর্য্যগণের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে, ও রোম সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইউরোপের ইতিহাস নূতন করিয়া আরব্ধ করে। ঠিক্ সেই সময়েই উহারা দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া পারস্য হইতে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ কাঁপাইয়া তোলে। পরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্য তাহাদের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের গতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান।

আরও সাতশত বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে অতীত হইল। পুনশ্চ মধ্যএশিয়া পৃথিবীর উপপ্লবের জন্য বর্ব্বরপাল প্রেরণ করিল। রুম সম্রাট্ ও দিল্লীর সম্রাট্ ও চীন সম্রাট্ একই সময়ে যুগপৎ জঙ্গিস ও তৈমুরের নামে কাঁপিতে লাগিলেন। আরও পাঁচশত বৎসর পরে দেখিতে পাই, রুমের সিংহাসনে তুর্কি বসিয়া রোমসাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, ও পৃথ্বীরায়ের সিংহাসনে মোগল বসিয়া হিন্দুর নিকট জিজিয়া আদায় করিতেছে।

প্রলয়।

বাল্যকালে এক দিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী এক সময়ে উল্‌টিয়া যাইবে। সে দিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কি না স্মরণ নাই। মনের ভিতর প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালার একটি প্রবীণতর বন্ধু আশ্বাস দেন, পৃথিবী উল্‌টাইবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও তাহার লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অবশ্য পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্‌টান অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ত্তমান উপস্থিতি অধিকতর উদ্বেগের কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রলয়তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। ফলে পিতামহী ঠাকুরাণীর উক্তির সহিত বন্ধুর আশ্বাসবাণী যোগ করিলে যে কয়টি কথা হয়, তাহার অধিক বিজ্ঞানশাস্ত্রও কিছু বলেননা। প্রলয় এক দিন ঘটিবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও দেরী আছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মুখেও এই রকমই কথা শুনা যায়। প্রাচীন কালের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অতি দূরদর্শী অথচ সরলপ্রকৃতিক ছিলেন। তাঁহারা অকস্মাৎ এক একটা বড় গভীর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেন; অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের ন্যায় যুক্তি-তর্কের জটিলতা ও কঠিনতার ভিতরে প্রবেশ করিতেননা। আজকাল লোকের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার অভাবে এইরূপ কুটিল পথে পরিভ্রমণই ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য ক্রমে দুই এক জন লোক এমন কদাচিৎ পাওয়া যায়, যাঁহাদের দূরদর্শিতা অধিক না থাক, বুদ্ধিরূপী আধ্যাত্মিক অণুবীক্ষণে সূক্ষ্ম দর্শন

শক্তির তীক্ষ্ণতাবশে তাঁহারা প্রাচীন উক্তির ভিতর নানাবিধ সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কার করেন। যাই হউক, আমরা সাধারণ মানব, সে কথা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের নিকটেই উত্তরের প্রত্যাশা রাখি।

বিজ্ঞান একরকম সদুত্তরও দিয়াছেন। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড সকলের কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে ঠিক্, তবে গরমে হইবে কি ঠাণ্ডায় হইবে বলা যায়না। অধ্যাপক জেবনস বিজ্ঞানের কথা বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইবারই সম্ভব। তবে এই পর মুহূর্ত্তেই যে হইবেনা, তাহাও বলা যায়না। এমন সদুত্তর আর কি হইতে পারে! উত্তর পাঠকের তৃপ্তিকর হউক আর না হউক, পাঁচ জন পণ্ডিতে এ সম্বন্ধে যে পাঁচ কথা বলেন, তাহাই এ প্রবন্ধে উপস্থিত করিব।

আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, সুতরাং অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাডষ্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্ত্তে আইরিশ হোমরুল হইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।

প্রথম কথা এই। আমাদের পৃথিবী সৌরজগৎরূপ একটি পরিবারের অন্তর্গত। সূর্য্যমণ্ডলকে মধ্যে রাখিয়া যে কয়টি ছোট বড় গ্রহ বহুকাল হইতে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবী তন্মধ্যে অন্যতম। সূর্য্যমণ্ডলের প্রবল আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে; কিন্তু ইহাদের পরস্পর আকর্ষণে কেহই একটা নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় ঘুরিতে পায়না। পৃথিবীও সেই জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথে ঘুরিতে পায়না; সর্ব্বদাই, সূর্য্যাকর্ষণনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে

একটু না একটু ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই, এই নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ভ্রংশ বা কক্ষাচ্যুতি বশতঃ এমন সময় কি আসিতে পারে না, যখন দুইটা গ্রহ অকস্মাৎ এক সময়ে এক জায়গায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর প্রতিঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে?

উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। নিউটন দুইটা পদার্থের মধ্যে আকর্ষণের নিয়ম বাহির করিয়া ভবিষ্যৎ পণ্ডিতবর্গের মস্তকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া দিয়া অব্যাহতি পান। জগতের মধ্যে দুইটামাত্র পদার্থ থাকিলে কোন্‌টা কখন কোথায় যাইবে, স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হইতনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগতের খণ্ডপদার্থের সংখ্যা দুইয়ের অনেক বেশী। তিনটা পদার্থ পরস্পরকে নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ করিতে থাকিলে কখন্ কোন্‌টা কোন্ খানে থাকিবে স্থির করিতে গণিতজ্ঞদের জীবনীশক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে আইসে। চারিটা পদার্থ লইয়া স্থির করিতে গেলে, সমস্যা বিভ্রাট্ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্যা দুরূহ সন্দেহ নাই; তথাপি লাপলাস এই সমস্যাপূরণে কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লাপলাস প্রতিপন্ন করেন, পরস্পরের আকর্ষণে গ্রহগণের চিরস্থায়ী কক্ষাচ্যুতির কোনরূপ আশঙ্কা নাই। সূত্রলম্বিত পেণ্ডুলম বা পরিদোলক যেমন স্বস্থান হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হয়না, কেবল সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ সহচরদের আকর্ষণফলে আপন পথ হইতে একটু ইতস্ততঃ বিচলিত হয় মাত্র; ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট পথের দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এমন বল কিছুই বর্ত্তমান নাই, যাহাতে চিরকালের মত তাহার রাস্তা বদলাইতে পারে। সুতরাং সৌরজগতের মধ্যে, গ্রহে গ্রহে ঠেকাঠুকি হইয়া মহাপ্রলয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

মহামনস্বী লাপ্লাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। পরবর্ত্তী গণিতজ্ঞেরা লাপ্লাসের যুক্তির অভ্যন্তরে কোন ভ্রান্তি ধরিতে পারেন নাই। এমন কি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কালেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত হুইবেল সাহেব লাপ্লাসের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন, দেখ বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল; সৌরজগতের মত এমন জটিল যন্ত্রের মধ্যে এমন সুনিয়ত শৃঙ্খলা যে, সেই যন্ত্র কখন বিকল হইবার সম্ভাবনা নাই। মা ভৈঃ, মানব, মা ভৈঃ! জগতের বিলোপ নাই।

লাপ্লাসের গণনায় প্রমাদ নাই সত্য, কিন্তু আর একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে। সুন্দর সুনিয়ত সৌরজগতের মধ্যে কোথা হইতে মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছধারী অজ্ঞাতকুলশীল ধূমকেতু নামে পদার্থ চলিয়া আইসে, তাহাদের দেখিলে অদ্যাপি পণ্ডিতগণেরও মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ধূমকেতুর উদয়ে মহামারী বা রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় কাঁসর ঘণ্টা বাজান লোকে আর আবশ্যক বোধ না করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের স্থিতি গতি আকার অবয়ব এমনি রহস্যপূর্ণ যে, একটু আতঙ্ক না হইয়াও যায়না। মাধ্যাকর্ষণ অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ধূমকেতুকেও অধীন রাখিয়াছে বটে; কিন্তু ইহারা কোথায় থাকে, কোথা হইতে আইসে, কিছুই যখন জানা নাই, তখন কোন অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের বলেই আমাদের নিকটে আসিয়া পৃথিবীকে একটা আকস্মিক ধাক্কা দিয়া ফেলিলে পণ্ডিতেরা তর্ক করিবার অবসর না পাইতেও পারেন। আজকাল এ আশঙ্কা কতকটা নিরাকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ধূমকেতুর আকার আয়তন যতই ভয়াবহ হউক, উহারা বড়ই লঘুপ্রাকৃতিক; অর্থাৎ কি না আয়তনে যে দশটা পৃথিবীর

সমান, ওজনে হয়ত সে দশ ছটাকও হয়না। সুতরাং দশটা পৃথিবী কেন, দশ হাজারটা সূর্য্যের সমান আয়তন হইলেও ধূমকেতুর ধাক্কা তত ভয়ানক না হইতেও পারে। আবার এরূপও শুনা যায় যে, ইতিমধ্যে আমরা অজ্ঞাতসারে দু একটা ধূমকেতুর অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছি, তখন কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় উল্কাবৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন উৎপাত লক্ষিত হয় নাই। আজকাল অনেকেই সন্দেহ করেন, ধূমকেতু কেবল উল্কাপিণ্ডের পালমাত্র। একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের সন্নিহিত হইয়াছিল। বৃহস্পতির তাহাতে কিছুই হয় নাই। ধূমকেতুরই গন্তব্য পথ বিচলিত হইয়াছিলমাত্র।

ধূমকেতুর সংঘর্ষের আশঙ্কা না থাকিলেও সৌরজগতের বাহির হইতে অন্য কেহ আসিয়া যে পৃথিবীর উপর নিপতিত না হইতে পারে, ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। লাপ্লা-সের গণনা সৌরজগতের অভ্যন্তরেই বর্ত্তে, বাহিরের কোন পদার্থের উপর বর্ত্তেনা। বাহির হইতে কোন পদার্থ কোন কালে আসিয়া আকস্মিক প্রলয় উৎপাদন করিতে পারেনা, সাহস করিয়া বলা যায় না। নক্ষত্র লোকে বরং এইরূপ আকস্মিক প্রলয়ব্যাপারের দুই একটা উদাহরণ দেখা যায়। কিছু দিন হইল হুগিন্স সাহেব একটা নক্ষত্রকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। হুগিন্স তাহার আলোকবিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, হঠাৎ হাইড্রোজেন অর্থাৎ উদজান বাষ্প জ্বলিয়া উঠায় ঐরূপ ঘটিয়াছে। হাইড্রোজেন পোড়াইলে অবশ্য জল হয়। কিন্তু একটা বোতলে হাইড্রোজেন পূরিয়া তাহা পোড়াইতে থাকিলে এত উত্তাপ জন্মে যে, তাহার ক্ষুদ্র শিখাতে লোহার পাত পর্য্যন্ত কাগজের মত পুড়িতে থাকে। সুদূর একটা নক্ষত্রে হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা [illegible] কাণ্ড নহে। পৃথিবীর ইতিহাসেও

বোধ করি এইরূপ ব্যাপার এক সময়ে ঘটিয়াছিল। আজকাল বায়ুর মধ্যে উদজান বর্ত্তমান নাই, কিন্তু এককালে যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য এক সময়ে সেই সমুদয় উদজান পুড়িয়া যায়; সেই দিন হইতে সমুদ্রের উৎপত্তি। আর এক্ষণে উদজানের অবশেষ পুড়িতে নাই; সে আশঙ্কাও নাই। উদজান ভিন্ন অন্য পদার্থও এত পরিমাণে বর্ত্তমান নাই, যাহা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটাইতে পারে। দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া ভূমণ্ডলে এখনও না চলিতেছে এমন নহে; তবে তাহা এত ধীরে সুস্থে সম্পন্ন হইতেছে যে, তাহাতে বিশেষ আশঙ্কা নাই; তবে ভূমিকম্পরূপে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমরূপে প্রাদেশিক উৎপাত সময়ে সময়ে ঘটায় বটে। হুগিন্স যে নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠা দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনা আরও কয়েকবার দেখা গিয়াছে। এই সেদিনই উত্তরাকাশে অরিগানামক নক্ষত্রপুঞ্জের সমীপে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব নক্ষত্র কিছুদিন ধরিয়া দীপ্তিসহকারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ নির্ণীত হইয়াছে ঠিক্ বলা যায়না। সর্ব্বত্রই যে অভ্যন্তরীণ কারণে নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠে এমন না হইতে পারে। লকিয়ারের মতে দুইটা বিশাল উল্কাপালের সংঘর্ষে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। বাহ্য বস্তুর আঘাত অর্থাৎ নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ ঘটিয়া অগ্ন্যুদ্গম অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবী আপন অন্তঃস্থ শক্তির বলে হঠাৎ ফাটিয়া শতখণ্ড হইতে পারে কি না? ভূমণ্ডলের অন্তর্ভাগ এখনও বিষম তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এত তপ্ত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব অবস্থাপন্ন বলিয়াই এতকাল সকলের সংস্কার ছিল। লর্ড কেলবিন দেখাইয়াছেন, ভূগর্ভ যতই তপ্ত হউক না কেন, উপরের ভূপঞ্জর চাপ এত অধিক যে অভ্যন্তর ভাগ দ্রব অবস্থায় থাকিতে পারে না। দ্রব

অবস্থায় যে নাই, তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। সমুদ্রে যেমন চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণগুণে জোয়ার ভাটার আন্দোলন অনবরত হইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব হইলে সেখানেও সেইরূপ আন্দোলন সর্ব্বদা চলিত। ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীর পক্ষে সে ব্যাপারটা বড় সন্তোষজনক হইতনা। সেরূপ আন্দোলন নাই দেখিয়া কেলবিন অনুমান করেন, ভূগর্ভ অন্ততঃ ইস্পাতের মত কঠিন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগটা অবশ্য এককালে তরল অবস্থায় ছিল বিশ্বাস করিতে হয়। কতদিন তারল্য গিয়া কাঠিন্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহারও একরকম মোটামুটি গণনা চলে। ভূপৃষ্ঠ ক্রমে ক্রমে শীতল ও কঠিন, বন্ধুর ও উচুনীচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে ফাট আছে। গর্ভস্থ তপ্ত পদার্থ কখন কখন সেই ফাট দিয়া প্রবল বেগে বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটা প্রচণ্ড কাণ্ড ঘটে; ইহারই নাম অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত। সেদিন ১৮৮২ সালের ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল পদার্থ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কতক কতক আজিও বায়ুরাশিতে ভাসিতেছে। হিসাবে দেখা যায়, কোন পদার্থ সেকণ্ডে আট মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা আর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসেনা। হয়ত পুরাকালে কোন প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর দুই এক টুকরা চিরকালের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সার রবার্ট বল সাহেবের মতে এইরূপে অনেক উল্কাপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। যাহাই হউক, পৃথিবীর অন্তঃস্থ শক্তি এখন যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ক্রাকাটোয়ার ব্যাপারের মত একটা ছোট খাটো প্রাদেশিক প্রলয় ঘটাইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে একটা মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা আছে বোধ হয়না। একটা প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে ফাটিয়া পৃথিবী

যে দ্বিধা বা সহস্রধা ভগ্ন হইয়া যাইবে, সেরূপ আশঙ্কা বড় নাই।

লাপ্লাস গ্রহগণের কক্ষাচ্যুতির একটা প্রবল কারণ গণনার মধ্যে ধরেন নাই। লর্ড কেলবিন স্বয়ং ও তৎপথানুবর্ত্তী জর্জ ডারুইন এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে একটু করিয়া কমিতেছে ও চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এমন দিন ছিল যখন চন্দ্র-মণ্ডল আমাদের আরও নিকটে ছিল। এমন সময় আসিবে যখন চন্দ্র আরও দূরে যাইবে। এখন চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আবর্ত্তিত হয়; তখন এগারশ কি বারশ ঘণ্টায় পৃথিবী আবর্ত্তন করিবে। এখন ছোট দিনের প্রায় তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়; তখন সেই বড় বড় দিনের সাত দিন কি আট দিনে বৎসর হইবে। মনুষ্যজাতিকে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না জানিনা; কিন্তু ঘটনাটা অনিবার্য্য।

যে কারণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে, ঠিক সেই কারণে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবে। পৃথিবীর কক্ষাচ্যুতির এই একটা কারণ। ইহার ফলনির্দ্দেশ বাহুল্য।

আর একটা কথা। আকাশ যে সর্ব্বতোভাবে শূন্য নহে তাহা স্থির। আলোকবাহী ও তাড়িততরঙ্গবাহী ঈথর নামক পদার্থ সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী সেই ঈথর ঠেলিয়া স্বীয় মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। জল কিংবা বায়ু পদার্থের গমনে বাধা দেয়; ঈথর অতিসূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ হইলেও যে কিছুমাত্র বাধা দেয়না তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। ঈথরের প্রতিঘাতক্ষমতা আছে কি না [illegible] সাহেব অনেক চেষ্টায় তাহার প্রমাণ পান নাই। [illegible] সাহেবের

আবিষ্কৃত ধূমকেতুর কক্ষাচ্যুতি ঈথরের প্রতিঘাত ভিন্ন অন্য কারণেও সম্ভব। সম্প্রতি অনেকে সাধারণ জড়পদার্থের সহিত ঈথরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানে কি দাঁড়াইবে বলা যায়না।

লর্ড কেলবিন একটা প্রকাণ্ড তথ্যের আবিষ্কর্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে জাগতিক শক্তির অপচয় বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি শক্তি জগতে নানামূর্ত্তিতে বিদ্যমান। কিন্তু শক্তি অপচয়োন্মুখী। শক্তিমাত্র আপনা হইতে সর্ব্বত্র তাপরূপে পরিণত হয়। ফলে এমন দিন আসিবে, যখন শক্তির আর প্রকারভেদ থাকিবেনা। সমগ্র শক্তি সর্ব্বত্র সমোষ্ণ তাপে পরিণত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের চলাচল বন্ধ হইবে। গ্রহ উপগ্রহ গতিরহিত হইয়া সূর্য্যে মিলিবে। ব্রহ্মাণ্ড গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন, তপ্ত অথবা শীতল, একটা অথবা কতিপয় মহাপিণ্ডের আকার ধারণ করিবে। এই পরিণাম নিবারণ করিতে পারে, এমন উপায় কিছু দেখা যায়না। যদি তত দিন ধরিয়া বর্ত্তমান নিয়মের অধীনতায় জগৎ চলে, তবে এই পরিণাম অনিবার্য্য। এই পরিণামকে মহাপ্রলয় বলিতে পার। হর্বার্ট স্পেন্সর মনে করেন, এই প্রলয়ান্তে পুনরায় নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। কিরূপে হইবে, তাহার সঙ্গত উত্তর কিছু দেননা।

হেলমহোলৎজ একটা প্রকাণ্ড কথা বলিয়াছেন। সূর্য্যমণ্ডল আমাদের জীবনদাতা। সূর্য্যমণ্ডল প্রভূত পরিমাণে তাপরশ্মি বিকিরণ করিতেছে। তাহার কণিকামাত্র লইয়া আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি, ও গতিবিধি। সূর্য্যমণ্ডলে তাপ জন্মিতেছে, আর বাহির হইয়া যাইতেছে; সূর্য্যমণ্ডল ততই আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইতেছে। সূর্য্যের পরিধি বৎসরে প্রায় আশী হাত খাটো হইতেছে। দুই হাজার বৎসরে

আমরা অবশ্য তাহা টের পাইনা; কিন্তু অর্দ্ধকোটি বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের আকার বর্ত্তমানের আট ভাগ অর্থাৎ দুই আনা মাত্র দাঁড়াইবে। এমন দিন আসিবে যখন ভাস্কর প্রভাহীন হইবেন। গগনপ্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া এমন নির্ব্বাপিত সূর্য্যমণ্ডল দুই একটার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সূর্য্যের সেই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। তাহার বহু পূর্ব্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে বলা বাহুল্যমাত্র।

প্রলয়সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এইরূপ উক্তি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুইবেল তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন, ভয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমণ্ডলী একরকম এক বাক্যে বলিতেছেন, ভরসাও নাই।

—